দুধ্‌ওয়া

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

দুধ্‌ওয়া

উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, চৈত্র ১৩৯৯

—কুড়ি টাকা—

প্রচ্ছদপট

দুধ্‌ওয়া অরণ্যের গণ্ডারের ছবি—তারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বর্ণানুলেপ—পূর্ণেন্দু রায়

পুস্তকের অঙ্গসজ্জা—পার্থপ্রতিম বিশ্বাস

DUDHWA

A travelogue on jungle by Umaprasad Mukherjee published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd., 10 Shyama Charan De Street, Calcutta-73

Price Rs. 20/-

ISBN 81-7293-107-7

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে এস. এন.
রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩ মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে
প্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত

বিষয়-সূচী

লেখকের অন্যান্য বই

তপোভূমি মায়াবতী
হিমালয়ের পথে পথে
কৈলাস ও মানসসরোবর
মণিমহেশ
ত্রিলোকনাথের পথে
কাবেরী কাহিনী
গঙ্গাবতরণ
কুয়ারী গিরিপথে
পঞ্চকেদার
আফ্রিদি মুল্লুকে
বৈষ্ণোদেবী ও অন্যান্য কাহিনী
পালামৌর জঙ্গলে
দুই দিগন্ত
জলযাত্রা
ক্যালাইড্যসকোপ
আরবসাগর তীরে
মুক্তিনাথ
আলোছায়ার পথে

দুধ্‌ওয়া
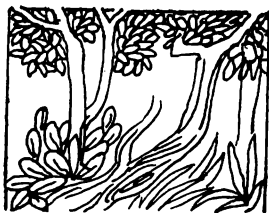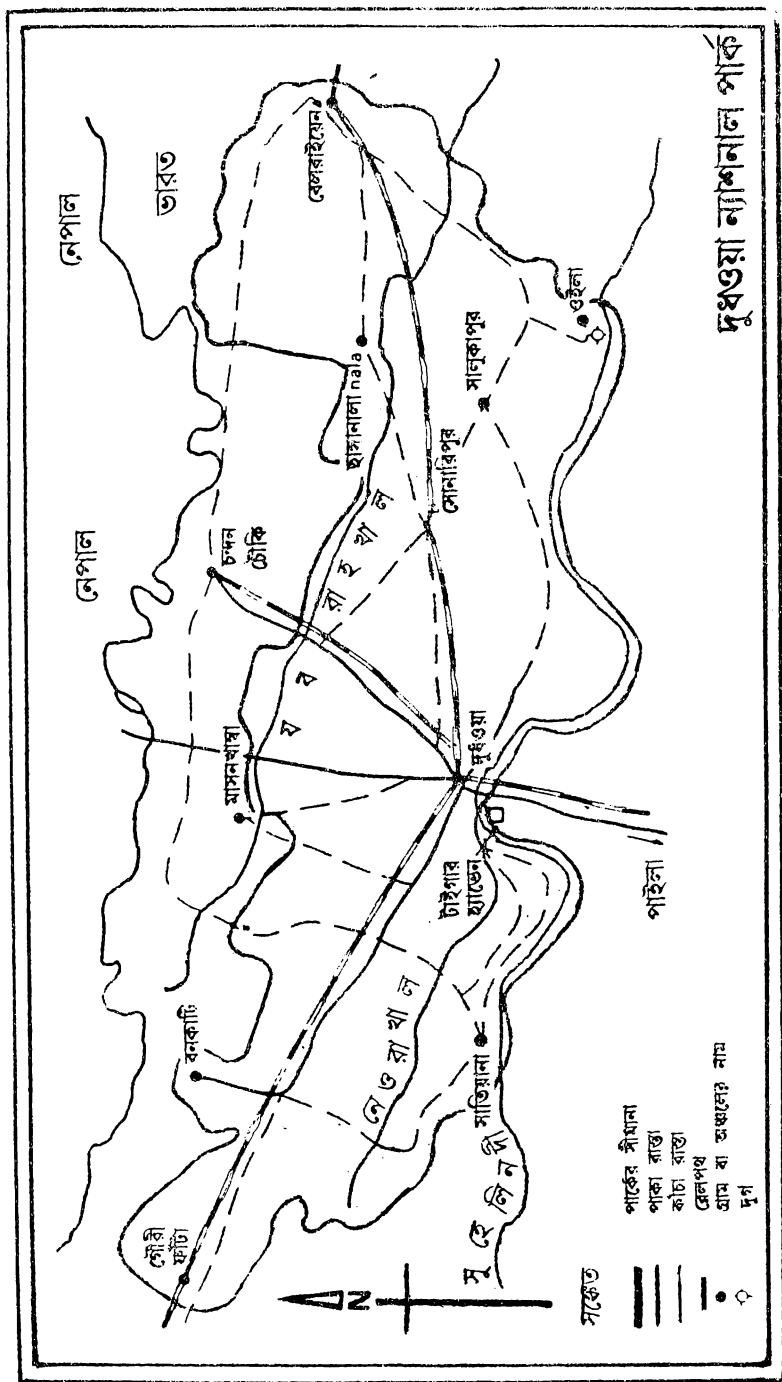
নেপাল
নেপাল
ভারত
গৌরী ফাঁটা
বনকাটি
মাসনখাম্বা
চন্দন চৌকি
বেলরাইয়েন
ছাঙ্গানালা nala
য ব রা হ খা ল
নে ও রা খা ল
টাইগার হ্যাভেন
দুধওয়া
সোনারিপুর
সালুকাপুর
সাতিয়ানা
সু হে লি ন দী
ওইলা
পাইলা
N
সঙ্কেত
পার্কের সীমানা
পাকা রাস্তা
কাঁচা রাস্তা
রেলপথ
গ্রাম বা অঞ্চলের নাম
দুর্গ
দুধওয়া ন্যাশনাল পার্ক

'দুধ্‌ওয়া !'

নামটা শুনে আশ্চর্য হই। এ-অদ্ভুত নামটা তো কখনও শুনিনি। কোথায় সেটা?

ভাই-পো চিত্তও অবাক হয়। বলে, সে কী! তুমি এ জঙ্গলের কথা জানো না। ওটা তো এখন ন্যাশানাল পার্ক। ইউ-পি-তে, নেপাল সীমান্তের তরাই-এ। লখ্‌নউ চলেছ আবার। সুবিধে হলে জঙ্গলেও একটু ঘুরতে যাবার ইচ্ছে, বলছ। করবেট পার্ক এখনও যাওনি? যেতে চাও, যেও। কিন্তু, ট্যুরিস্টদের ভিড়ের মধ্যে সে-পার্ক এখন তোমার আর তেমন ভাল লাগবে? বরং ঘুরে এস দুধ্‌ওয়াতে। নামটা বেশি প্রচার হয়নি, তাই রক্ষে, জঙ্গলের আদিম রূপটা এখনও ঠিক বজায় আছে সেখানে। তাছাড়া অন্যান্য জঙ্গল থেকে অনেক কিছু বৈশিষ্ট্যও আছে। দেখে এস। আমারও দেখা হয়নি ওটা। যাব কোথা থেকে কীভাবে যেতে হয়, সব খবর নিয়ে এস।

সেই 'দুধ্‌ওয়া' নাম মনের গোপনে জপ করতে করতে আমার লখ্‌নউ যাত্রা। অবশ্য ভাবনাও থাকে। এই বয়সে এখন আর একা

একা আগের মত ঘোরাঘুরি সম্ভব হবে? তবুও, মনকে ভোলাই, এই বলে, চল ত', লোভ কোরো না বেশি। ধৈর্য ধরে আকাঙ্ক্ষা রাখ, যাঁর হাতে পূরণ করার চাবিকাঠি, দেখ, তাঁর কী ইচ্ছে!

সেই তিনিই সময়কালে চাবিকাঠিটি খুলে দেন বিচিত্র পরিস্থিতিতে!

অথচ, লখ্‌নউ যাওয়ার আমার প্রধান কারণ, সেখানে মিশনের সেবাশ্রমের হাসপাতালে ভাঙা হাতের আবার 'ফিজিওথেরাপী' করাতে। থাকতে হবে অন্তত মাস দুই। তারপর, বেশি গরম পড়তে শুরু হলে চলে যাওয়া পাহাড় অঞ্চলে। সেখানেও আর ঘোরাঘুরি নয়। শান্ত হয়ে বসে হিমালয়ের নির্জন নিভৃতিতে দিন কাটানো।

যুক্তপ্রদেশের সেই দারুণ গ্রীষ্মও যথাসময়ে উঁকি মারে। কদিন পরে পাহাড়ে পাড়ি দেওয়ার আয়োজনও হয়। কিন্তু, জঙ্গলে যাওয়া?

পাহাড়ে রওনা হবার আগে সেদিকে দু'দিন ঘুরে আসার ব্যবস্থা হয় না? স্বামিজীকে মনের বাসনা জানাই।

তিনি বলেন, বেশ ত', ব্যবস্থা হয়ত হয়ে যাবে। এখানে বন-দপ্তরের অ্যাডিশনাল্ চীফ্ কন্সারভেটরের সঙ্গে আমার যথেষ্ট পরিচয় আছে। তাঁর কাছে খোঁজ নিচ্ছি। চতুর্বেদী লোকটি বড় ভাল। আপনিও আলাপ করে খুশি হবেন।

জিজ্ঞাসা করি, ইনি কোন্ চতুর্বেদী? অমরনাথ নয় তো?

স্বামিজী জানান, অমরনাথ কিনা জানি না। তবে হাঁ, এ এন্. চতুর্বেদীইত' বটে। অমরনাথ নাম হতে পারে। চেনেন নাকি? তাঁর বাড়ির টেলিফোন নং আমার জানা। কথা বলে দেখবেন?

আমি বলি, অমরনাথের সঙ্গে আমার পরিচয় সেই ১৯৫৫ সালে। প্রথম যেবার নন্দনকানন, লোকপাল, বিরেহী-তাল যাই। ঘাঙ্রিয়ার পথে তাঁর সঙ্গে দেখা। সে তখন সবে নতুন D. F. O। চলেছে —ঘাঙ্রিয়ার বনবিভাগের বিশ্রামভবন তৈরি হচ্ছে, তারই পরিদর্শনে। চমৎকার ছেলেটি। মথুরায় বাড়ি। সে-ই ত' তারপর আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঐ সব জায়গায় ঘোরাল! 'হিমালয়ের পথে পথে'-তে তার কথা লিখেছি। সে-ই এখন চীফ্ কনসারভেটর নাকি?

স্বামিজী বলেন, চলুন না, টেলিফোন করে দেখবেন?

টেলিফোন করি। ওদিকে ভারিক্কি গলায় উত্তর শুনি, 'চতুর্বেদী স্পিকিং'!

নম্র কণ্ঠে আমার নাম জানিয়ে জিজ্ঞাসা করি, এ-নাম কি আপনার পরিচিত?

সেই অফিসিয়াল কণ্ঠস্বর নিমেষে শ্রদ্ধা-বিগলিত হয়। সুমিষ্ট ধ্বনিতে উত্তর আসে, হ্যালো স্যার! আপনি! আপনি এখানে! কোথায়? কবে এলেন? আমাদের সেই দেখা! সে-ই, হাঁ-১৯৫৫তে। একত্রিশ বছর আগে!

আমিও উৎফুল্ল হই! বলি, ঠিকই তোমার মনে আছে। এখন বল, কখন কোথায় আমাদের দেখা হবে? তখনি ঠিকও হয়ে যায়, আমিই তাঁর দপ্তরে যাব, আজই।

সেইমত যাই-ও।
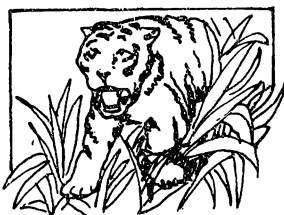
বনবিভাগের বিরাট সদর দপ্তর। বড় অফিসারের ঘর। দরজা দিয়ে ঢুকতেই দেখি—চেয়ারে বসে সেই অমরনাথই বটে। চোখের সেই বুদ্ধিদীপ্ত, স্নিগ্ধ চাহনি। তবে সেই তরুণ অমরনাথ নয়, প্রৌঢ়ত্বের ছায়া নেমেছে মুখমণ্ডলে। চোখের নীচে বলিরেখা। মাথাও বিরলকেশ। ৩১ বছর আগে আমাদের পরিচয়—কোথায় সেই হিমালয়ের শান্ত নির্জন পার্বত্য রাজ্যে—প্রকৃতির লীলভূমিতে, উন্মুক্ত পরিবেশে। আর, এতোদিন পরে আজ আবার দুজনের দেখা, এই লোকাকীর্ণ শহরের কর্মব্যস্ত সরকারী দপ্তরের সাজানো গোছানো অফিসিয়াল কামরায়, যেন আবদ্ধ আবহাওয়ায়!

তবে পরিবেশেরই বিবর্তন, মানুষ একই।

দীর্ঘদেহী অমরনাথ তড়িৎগতিতে চেয়ার ছেড়ে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ায়। এগিয়ে নিকটে আসে। সাদর অভিবাদন করে চেয়ারে

বসায়। বলেন, স্যার আপনি তো এখনও তেমনই রয়েছেন। পাহাড়েও ঘুরছেন নিশ্চয়? ওঃ! সেই দেখা আবার অ্যাদ্দিন পরে! আপনার তোলা সেই আমার ফটো এখনও মাঝে মাঝে দেখি ছেলেমেয়েদের দেখাই, আপনার গল্প করি। ছেলে এখন পড়াশুনা শেষ করে চাকরিতে ঢুকেছে, মেয়ে কলেজে পড়ছে।

আমি বলি, আর তোমার সঙ্গে সেই প্রথম যখন আলাপ, তুমিও সবে চাকরিতে ঢুকে বিয়ে করেছ। তা তো হোল। কিন্তু, বাইরে থেকে আমাকে যা দেখছ, সেটা আমার পোশাকি লোকদেখানো রূপ। জরাকে সযত্নে ঢেকেঢুকে রাখা। বার্ধক্যের উপসর্গগুলো তাদের ন্যায্য দাবি জানাবে, এতো স্বাভাবিক। সাদরে তাদের মেনেও নিতে হয়। কিন্তু, দুর্দৈবে একটা হাত ভেঙেছে—না, না, হিমালয়ের পথে নয়, হলে তো সেটা দেহের গৌরবের ভূষণ হোত—তোমাদের সভ্যজগতে, একটা দুর্ঘটনায়। সে যাক, তাছাড়া দৃষ্টিশক্তিটাও ক্ষীণ হয়ে আসছে। তাই, এখন একা একা ঘোরাফেরা যথাসম্ভব কমাতে হয়েছে, সাবধানও হয়েছি! তবুও মনের ক্ষুধা মেটে কই। মাঝে মাঝে জেগে ওঠে। এখন কথা হচ্ছে, নতুন চাকরিতে ঢোকা এক তরুণ ডি এফ ও একদিন এক প্রৌঢ়কে সঙ্গে নিয়ে হিমালয়ে ঘুরেছিল, এখন এক প্রবীণ বড় অফিসার ৮৪ বছরের এক স্থবিরকে একটা ভাল জঙ্গল দেখানোর ব্যবস্থা কি করতে পারবে?

অমরনাথের প্রফুল্ল মুখে তার সেই সহজ সরল হাসি ফুটে ওঠে। উৎসাহিত হয়ে বলে, আপনি একটা জঙ্গলে ঘুরতে যাবেন? কবে, কোথায় বলুন। নিজেই সঙ্গে নিয়ে যাব। কোন অসুবিধে হবে না আপনার। আমার তো ট্যুর প্রোগ্রাম রয়েছে। দেখুন করবেট ন্যাশানাল পার্কের প্রচার খুব। কিন্তু, আপনাকে যা জানি, ওখানকার চেয়েও অনেক ভাল লাগবে আপনার দুধ্‌ওয়ার জঙ্গলে। যাননি নিশ্চয়?

কী আশ্চর্য! অমরনাথও সেই দুধ্‌ওয়ার কথাই বলেন!

তখনি দিন স্থির হয়ে যায়। অমরনাথ জানান, সেদিন দুপুরে একটু তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে তৈরি থাকবেন। আপনাকে তুলে নিয়ে রওনা হব। তার আগে, কালই আপনার কাছে যাচ্ছি, বসে গল্প করা যাবে। উঃ! কদ্দিন পরে দেখা!

আমিও ভাবি, কী আশ্চর্য! অলক্ষ্যে কোথায় বসে কে এমন করে মানুষের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা ভাঙা গড়ার পুতুলখেলা খেলতে থাকেন!

॥ দুই ॥

১৯৮৬, ১৯শে এপ্রিল।

দুপুরে পৌনে বারোটায় অমরনাথের সঙ্গে যাত্রা। তার নিজের মোটরে। লখনউ শহর ছাড়িয়ে হু হু করে মোটর ছোটে। চমৎকার পীচ বাঁধানো চওড়া রাস্তা। এ সময়ে যান-বাহনের ভিড়ও তেমন নেই। লোকালয় আসে। মোটরের গতিবেগও কমে। পথের দুপাশে দোকান-পাট, ঘরবাড়ি। ছাড়িয়ে এলেই আবার মোটর সবেগে ছুটে চলে। যুক্তপ্রদেশের দুর্দান্ত গ্রীষ্ম এখনও দেখা দেয়নি। দুপুরের বাতাসও গরম নয়। বড় শহর সীতাপুর ছাড়িয়ে চলি। লখিমপুর আসে।

অমরনাথ বলেন, দুধ্‌ওয়ার জঙ্গল এই লখিমপুর-খেরী জেলার অন্তর্গত। এককালে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে এসব জায়গা পর্যন্ত গভীর অরণ্যাঞ্চলের অংশ ছিল। এখনও এগিয়ে যেতে যেতে দেখতে পাবেন, মাঝে মাঝে কিছু বন রেখে দেওয়া হয়েছে। এই লখিমপুর-খেরীর জঙ্গল বাঘের জন্যে প্রসিদ্ধ। বাঘের অত্যাচারের বহু কাহিনী আছে। এখনও কখনও সখনও এ-অঞ্চলের বাঘের হাতে মানুষের প্রাণ হারানোর ঘটনা পত্রপত্রিকায় ছাপা হয়।

আমি বলি, এই তো কদিন আগে লখনউ-এর কাগজে সেই রকম এক দুর্ঘটনা পড়লাম। লখিমপুর-খেরী জেলারই খবর বটে। দুধ্‌ওয়াতেই নাকি ?

অমরনাথ বলেন, সেটা কিছুকাল আগেকার ঘটনা, এখন ছেপেছে—সেটা দুধ্‌ওয়াতে ঘটেনি। দুধ্‌ওয়াতে সম্প্রতি একটা ঘটেছে। গিয়ে শুনবেন। দুধ্‌ওয়ার জঙ্গলে বাঘও দেখতে পাবেন। এতো সংখ্যক বাঘ ওখানে, দেখা না পেয়ে কেউ ফেরে না। ১৯৮২ সালের গণনায় পাওয়া গেছে ৬৫টা বাঘ, এখন সম্ভবত বেড়ে গিয়ে ৭০টা হয়েছে।

আমি বলি, গিস্‌গিস্‌ করছে বল,—তোমাদের এ-দেশের খাটিয়ার 'বাগ'-এর মতন! কিন্তু, তার আগে ঐ ন্যাশানাল পার্কের ইতিহাসটা শোনাও দিকি। আর সেখানকার বিশিষ্টতাই বা কী!—গাড়ীর বাইরে নজর পড়ায় বলি, এটা আবার কোন শহর এল ?

এরি মধ্যে চলে এলাম গোকর্ণে। এটাও বড় জায়গা। কি ঘিঞ্জি রাস্তা দেখেছেন ?

আমি বলি, ওঃ! গোলা গোকর্ণ! এখানে ত' মাকে নিয়ে একবার এসেছিলাম—১৯৪৫-এ। লখনউ এ সেবার বাড়ির সবাই মিলে পূজার ছুটি কাটানো হচ্ছিল। এ অঞ্চলের এটা তো একটা বড় তীর্থস্থান।

অমরনাথ বলেন, জানেন দেখছি। শহর ছাড়িয়ে কিছুদূর এগিয়ে পথের ধারে কোথাও ছায়ায় মোটর দাঁড় করানো যাবে। আমি সঙ্গে

লাঞ্চ নিয়ে এসেছি। বেরুনোর আগে সারতে পারিনি। অবশ্য লাঞ্চ মানে পরোটা, সবজি চাটনি আর মিষ্টি। আপনিও খাবেন কিছু,— আজ তো সেই দশটার আগে বোধহয় ভাত খেয়েছেন।

গোলা গোকর্ণের জনবসতি ছাড়িয়ে আসি। দুদিকে উন্মুক্ত প্রান্তর। দিগন্ত বিস্তীর্ণ। পথের দুপাশে বড় বড় গাছ। শাখা-প্রশাখা ছাড়িয়ে গাছের নীচে ছায়া বিছিয়ে প্রকাণ্ড বট, অশথ বা আম জাম গাছ নয়। মাথা উঁচু ইউক্যালিপ্টাস গাছের সারি। ছায়াবিরল। গাড়ী এগিয়ে চলে ছায়ার সন্ধানে। ভাগ্যক্রমে এক সারি করে গাছ নয়, পাশাপাশি কয়েকটা সারি। তারই তলায় এক জায়গায়, ওরই মধ্যে একটু বেশি ছায়া দেখে মোটর দাঁড়ায়। চাপরাসী নেমে গিয়ে সতরঞ্চি পাতে। আমরাও নেমে বসি।

প্রকৃতি যেন রৌদ্রছায়ার ডুরে-কাটা চাদর গায়ে জড়িয়ে দেন। আমি মন্তব্য করি, এই সব গাছ বাগানেই সুন্দর দেখায়। মধুপুরে বাড়ির বাগানে বাবা লাগিয়েছিলেন সেই সত্তর-বাহাত্তর বছর আগে—পরেও কয়েকটা লাগানো হয়েছিল—এখনও তার কয়েকটা রয়েছে। সাঁওতাল পরগণার অনেক বাড়িতেই এ গাছ দেখতে পাওয়া যায়। বাগানের চমৎকার শোভা। কিন্তু সুদূরগামী পথের দুধারে এদের এভাবে বসানোর সার্থকতা কী বুঝি না। পথ

দিয়ে চলে পথিক। চিরকালের আম জাম বট-অশত্থ-এর শান্তশীতল ছায়ায় ক্লান্ত পথিকের বিশ্রামের আশ্রয়। আর এ গাছগুলির সে-ছায়া দেবার ক্ষমতা কই!

অমরনাথ বলেন, তা সেদিক থেকে ঠিকই বলেছেন। এখনও প্রায় সব পুরনো রাস্তার ধারে সেইসব প্রাচীন গাছই বেঁচে আছে। সে-সব গাছ এখনও কোথাও কোথাও লাগানোও হয়। কিন্তু, এ-অঞ্চলে এই ইউক্যালিপ্টাস লাগানোর কারণ আছে। এ-গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। বেশি যত্ন নেবারও প্রয়োজন হয় না। আর পাশাপাশি কয়েক সারি লাগিয়ে গেলে, ছায়াও কিছুটা হয়। তবে দেখতেও হবে, প্রথম সারি পথের খুব নিকটে যেন দেওয়া না হয়। এই এখানে দেখছেন, রাস্তা থেকে বেশ খানিক দূরে। এর কারণ, এ গাছ বড় হলে তার সরু সরু ডালপাতা প্রায়ই ভেঙে পড়ে, পথে পড়লে গাড়ী চলাচলে বিঘ্ন ঘটাবে। তাই সবচেয়ে ভালো হয়, রাস্তার নিকট প্রথম সারিতে আম জাম বট অশথ তেঁতুল প্রভৃতি গাছ লাগিয়ে তার খানিক পিছনে ইউক্যালিপ্টাস লাগানো।

প্রশ্ন করি, এ-গাছ বিদেশ থেকে আমদানী হয়েছিল। বাগানের শোভা বাড়াতেই লাগানো হোত। ইদানীং হঠাৎ এর এতো প্রচলন হোল কেন? এখন দেশের বহু জায়গায় দেখা যায়, কেবলি এই গাছ লাগানো হচ্ছে। এমন কি বনে-জঙ্গলেও।

চাপরাসী নিকটে মাঠের মাঝে কোন পুকুর থেকে জল নিয়ে আসে।
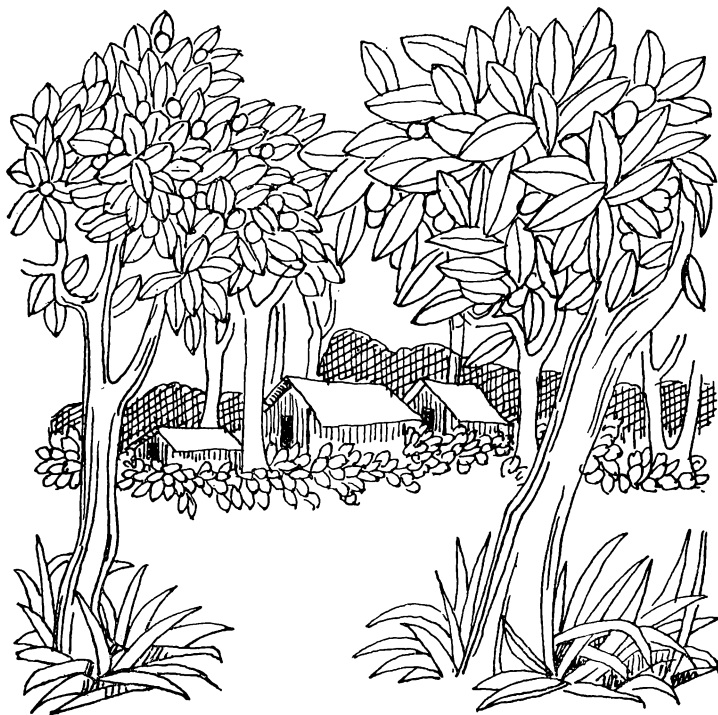
উঠে হাত মুখ ধুয়ে খেতে বসা হয়। খেতে খেতে আবার গল্প।

ইউক্যালিপ্টাস-এর দুটো শুকনো পাতা হাতে গুঁড়িয়ে শুঁকি। বেশ লাগে।

সেই সুবাসে মনে স্মৃতির দুয়ার খোলে। মনে পড়ে, মধুপুরে মেজদা চা করার সময় টি-পটে এই পাতাও দেওয়াতেন। একবার ঘি-ভাতও রান্না হয় এই পাতা দিয়ে, তাঁরই উৎসাহে!

অমরনাথের কথায় চমক ভাঙে। বলেন, এ-গাছ ভারতে প্রথম কবে আসে জানেন? প্রায় দু'শ বছর আগে—১৭৯০ সালের কাছাকাছি। অস্ট্রেলিয়া থেকে টিপু সুলতান আনিয়েছিলেন। মহীশূরের নিকটে তাঁর প্রাসাদ-উদ্যানে লাগান—নন্দী হিল্-এ।

বছর পঞ্চাশ পরে ক্যাপ্টেন কটন নীলগিরি পর্বতে রীতিমত এই গাছ লাগানোর পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে থাকেন। ক্রমে অন্যত্রও শুরু হয়ে যায়। আমাদের দেশে সাধারণ ইউক্যালিপ্টাস এখন যা দেখা যায়, তা সেই টিপুর আনানো গাছেরই বংশ বলা চলে। এ গাছের এখন এত বেশি প্রচারের কারণ, বাণিজ্যিক সামগ্রী হিসাবেও এর প্রচুর দাম। এ গাছ খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। এর কাঠ শক্ত ও বেশ ভারী। ভাল তক্তা, কড়িকাঠ, খুঁটি ইত্যাদির জন্য ব্যবহার করা যায়। কাগজ তৈরির জন্যে ভাল 'পাল্প'ও পাওয়া যেতে পারে। শক্ত বোর্ডও এ থেকে হতে পারে। জ্বালানি ভাবে ব্যবহার ত চলেই, কাঠকয়লাও

করা হয়। তাছাড়া, পাতা থেকে রোগনিবারক দামী তেলও হয়।

আমি বলি, তোমার ইউক্যালিপ্টাস প্রশস্তি শুনলাম। এখন বুঝছি, মাদুপুরের ব্যবসাদারদের কেন ঐ গাছগুলোর ওপর অমন লুব্ধ দৃষ্টি—কত সাজানো বাগান শ্রীহীন হয়ে যাচ্ছে। যাক্ এখন চল, আবার রওনা হওয়া যাক। গাড়িতে বসে এখন দুধ্ওয়ার জঙ্গলের ইতিবৃত্তটা শুনতে হবে।

গাড়িতে বসে অমরনাথ বলে, লখিপুর ছাড়িয়ে আসার সময় আপনাকে একটা খবর বলা হয়নি। ওখান থেকে দুধ্ওয়া যাওয়ার আর একটা মোটরপথ আছে। নিঘাসন হয়ে। তাতে ২০/২২ কিলোমিটার দূরত্ব কম হয়। কিন্তু রাস্তাটা তেমন ভাল নয় সবটা। তাই, আমরা একটু ঘুরেই চলেছি—মৈলানি হয়ে। এ-পথে লখনউ

থেকে দুধ্ওয়া ২৬০ কিলোমিটার। মৈলানি ছাড়িয়ে যাওয়ার কিছু পরেই সারদা নদীর ওপর পুল পার হবো।

শুনে বলি, সারদা? সারদাই ত হিমালয়ের মধ্যে কালী নদী। কৈলাস মানসসরোবর যাত্রাকালে তারই পাশ দিয়ে অনেকখানি যেতে হয়েছিল। নদীর অপরপারে নেপাল রাজ্য।

অমরনাথ খুশিমুখে বলে, ঠিকই বলেছেন। সেই কালী নদী হিমালয় থেকে নেমে নাম নিল সারদা। তারপর উত্তরপ্রদেশের সমতল দিয়ে বয়ে চলল পূর্ব-দক্ষিণ মুখে। আর সেই নদীর উত্তরে অর্থাৎ বাম তীরে পাহাড়ের তরাই অঞ্চল। সে তরাই ভারতের মধ্যে। তারই এক অংশে দুধ্ওয়ার জঙ্গল। তার উত্তর সীমান্তে নেপাল রাজ্য।

সেদিকে সীমানা কি?

কিছুই নেই। পাহাড়ী ছোটখাট নদী কোথাও আছে। সেইটেই ত দুধ্ওয়ার একটা বিরাট সমস্যা। কেননা, সীমানার ওপারে নেপালে, জঙ্গল সাফ করে, নেপাল সরকার অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকদের কলোনী বসিয়েছেন। আর তাদের সবারই আছে বন্দুক। বুঝতেই পারছেন, ফলে আমাদের দিকের বনে ঢুকে তাদের চোরাগুপ্তি শিকার। আমাদের অশান্তির দুর্ভোগ।

অমরনাথ তারপর হেসে বলে, একবার ত হাতে-হাতে কজন এর প্রতিফলও ভোগ করে। দুধ্‌ওয়া ন্যাশানাল পার্ক ঘোষিত হবার পরের বছরের ঘটনা। এক মাসের মধ্যে তিন-তিনটে ঐ কলোনীর বাসিন্দা সৈনিক আমাদের পার্কের মধ্যে বাঘের হাতে প্রাণ হারায়।

আমি বলি, তাহলে বাঘরাই তোমাদের উপযুক্ত বনরক্ষী! এখন এবার দুধ্‌ওয়ার ইতিহাসটা বলো।
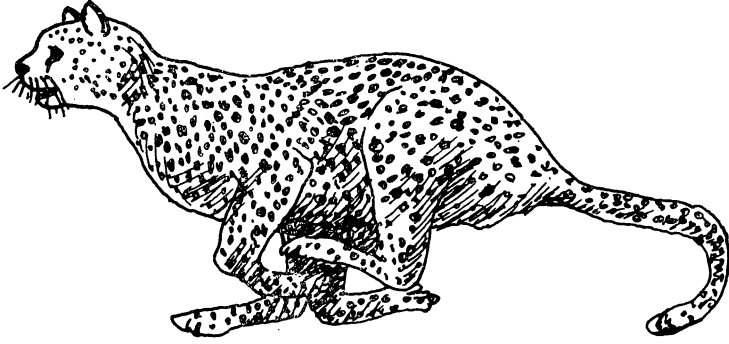
এই তরাই অঞ্চলের বিশালকায় শাল, শিশু—অরণ্যসম্পদ ইংরেজ আমলে বিদেশী সরকারের ব্যবসায়ী দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রাধান্য লাভ করে। সেই সব গাছ কেটে আনার আয়োজন করতে ঐ গভীর জঙ্গল ভেদ করে রেল লাইনও বসল। এখনও সে লাইন আছে জঙ্গলের মধ্যে।

দেখতে পাবেন। ট্রেন চলাচলও আছে। তবে অল্প সংখ্যক। বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তাবোধ সে আমলে জাগেনি। বহু পরে তার ব্যবস্থাদি শুরু হয়।

আমাদের স্বাধীনতালাভের পর বনরক্ষার পরিকল্পনা আরও ভাল-ভাবে গড়ে ওঠে। বিশেষত বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্যে আইনকানুন ও ব্যবস্থাদি কড়া হাতে প্রয়োগ করা হতে থাকে।

১৯৫৮ সালে ঐ জঙ্গলের ৬২ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চল সোনারিপুর Wild Life Sanctuary বলে ঘোষিত হয়। কিছুকাল পরে তার বিস্তার বাড়িয়ে ২১২ বর্গ কিঃ মিঃ যোগ হয়। নামকরণও হয়ে যায় Dudhwa Wild Life Sanctuary। অবশেষে ১ লা ফেব্রুয়ারি ১৯৭৭ সালে ঐ বন National Park-এর মর্যাদাও পায়। তখন তার বিস্তৃতি আরও বাড়িয়ে করা হয়েছে ৬১৩ বর্গ কিলোমিটার।

তার মধ্যে Core-৪৯০ বর্গ কিঃ মিঃ, Buffer ১২৩ বর্গ কিঃ মিঃ। এই অভয়ারণ্য ঘোষণা করানোর মূলে. কে জানেন? তিনি অর্জুন সিং! নাম শুনেছেন নিশ্চয়?

আমি উৎসুক হয়ে বলি, শুনেছি বই কি। বাঘ সম্পর্কে তিনি তো বিখ্যাত বিচক্ষণ ব্যক্তি, প্রসিদ্ধ শিকারীও। নরখাদক বাঘদের স্বভাব বদলানোর জন্যে কীসব পরীক্ষা করছিলেন—কাগজে পড়েছিলাম। তবে কীভাবে করছিলেন, তা জানি না। তিনি থাকেন কোথায়?

অমরনাথ বলেন, তাঁরই কর্মভূমিতে চলেছি। ঐ দুধ্‌ওয়ার নিকটেই থাকেন। পার্কের তিন কিলোমিটার মাত্র দূরে, সুহেলী নদীর ধারে তাঁর মস্ত ফার্ম। আলাপ করিয়ে দেব। চমৎকার মানুষ। ফার্মের নাম রেখেছেন Tiger Haven—বাঘেদের অভয় আশ্রম।

তিনিই একমাত্র এশীয় World Wild life Fund এর স্বর্ণপদক লাভ করেন। বন্য জীবজন্তুদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা। তাঁর ফার্মে এসে বনের হরিণরা নির্ভয়ে চরে বেড়ায়।

বন্যপ্রাণী শিকার করার, যে কোন কারণেই হোক না কেন, তাদের হত্যা করার তিনি ঘোর বিরোধী। বলেন, জগতে যেমন মানুষের বেঁচে থাকার অধিকার, বন্য জীবজন্তুদেরও ঠিক তেমনি নিজ বাসভূমি বনে জঙ্গলে বাস করে প্রাণধারণের সমান অধিকার।

তাঁর মতে হিংস্র মানুষও যেমন থাকে, বন্যপ্রাণীও তেমনি স্বভাববশত বা ঘটনচক্রে হিংস্র হতে পারে, আশ্চর্য কী! কিন্তু তার জন্যে তাকে মেরে ফেলতে হবে কেন? তার সেই হিংস্র বৃত্তি ভাল করার চেষ্টা ও ব্যবস্থা করা দরকার—যেমন মানুষ সম্বন্ধেও করা হয়। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর ফার্মে বাঘ ও লেপার্ডের বাচ্চা ধরে এনে প্রতিপালন করতে থাকেন। বাজার থেকে মোষের মাংস কিনে এনে খাওয়ান। বড় হলে তাদের আবার বনে ছেড়ে দেন।

বাঘেদের পুনর্বাসনের তাঁর এই অভিনব পরিকল্পনা ও প্রচেষ্টার জন্যে জগতে তাঁর নাম প্রচারিত হয়ে পড়ে। যেমন, সেই আফ্রিকায় জয় অ্যাডামসনের সিংহ প্রতিপালনের ঘটনাও প্রচার পায়। Born Free প্রভৃতি বিখ্যাত বই পড়েছেন নিশ্চয়? সিনেমাতেও হয়ত দেখেছেন?

বলি, বইগুলি পড়েছি। সিনেমাটা দেখার সুযোগ হয়নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ত সেখানে একটা ট্রাজেডি ঘটে গেল।

অমরনাথ বলেন, এখানে অবশ্য সে-পরিস্থিতি হয়নি। এখানেও এক বিদেশী অর্জুন সিং-এর বাঘ প্রতিপালনের একটা ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে বিদেশে টেলিভিসনে দেখিয়েছেন।

কিন্তু বন দপ্তরের অনেক অফিসাররা অর্জুন সিং-এর ওই পরীক্ষামূলক কাজকর্মের বিরূপ অভিমত প্রকাশ করেন। তাঁরা বলেন, ফার্মে এনে বাঘের বাচ্চা প্রতিপালনে স্থানীয় লোকেদের বিপদের যথেষ্ট আশংকা রয়েছে। তাছাড়া ঐভাবে প্রতিপালিত বাঘ বনে ফিরে গিয়ে তার স্বাভাবিক খাদ্য বনের জীবজন্তু শিকারে অভ্যাস ও উপযুক্ত পটুত্ব না থাকায় ঠিকমত খাদ্য সংগ্রহ করতে পারে না, নরখাদক হয়ে ওঠে।

অর্জুন সিং-এর প্রতিপালিত বাঘিনী "তারা" এই কারণেই বনে ছাড়া পেয়ে একজন বনকর্মীকে মেরে ফেলে বলে তাঁদের বিশ্বাস। কদিনের মধ্যে ২২ জনেরও সে প্রাণনাশ করে। অবশেষে তারাকে গুলি করে মারতেও হয়। লোকে বলতে থাকে, বাঘ পুষে ছেড়ে দিয়ে শেষ পর্যন্ত কি মানুষের প্রাণ নিয়ে টানাটানিই চলবে?

কাহিনী শুনে আমি মন্তব্য করি, আমাদের সভ্য সমাজেও তো এইভাবে চোর-ডাকাত-খুনীদের মনোবৃত্তির পরিবর্তন করে 'স্বাভাবিক

জীবনযাত্রা করানোর চেষ্টা চলেছে। কিন্তু শুধু মানুষেরই নয়, প্রাণীমাত্রেরই যেখানে অভাবের্র চাপে নয়, স্বভাবের বশে, হত্যা করার প্রবৃত্তি থাকে, তখন সে স্বভাব পরিবর্তন করা খুব সহজ কথা নয়।

অমরনাথ বলে, এই সূত্রে অর্জুন সিং-এর আর এক 'এক্স্‌পেরিমেণ্ট'ও বলি। সেটা কিন্তু সে-ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হয়েছিল। দুধ্‌ওয়া ন্যাশনাল পার্ক হবার পর এখানে প্রথম যে নরখাদক বাঘটি দেখা দেয়, তার কবলে চারজনের মৃত্যু ঘটে। আশপাশের গ্রামের লোকজন স্বভাবতই ভয় পায়, বাঘটাকে এখনি মেরে ফেলা দরকার, দাবি জানায়।

অর্জুন সিং ও পার্কের ডিরেক্টর রামলক্ষ্মণ সিং ভাবতে থাকেন, বাঘটাকে না মেরে বনে থাকতে দেওয়া যায় কী উপায়ে? কিন্তু বাঘটাই বা হঠাৎ এভাবে পর পর চারটে মানুষ মারল কেন? অনুসন্ধান করে কারণও বোঝা গেল।

বাঘেরা সাধারণত দিনের বেলা বিশ্রাম করে জলের কাছাকাছি কোন নিভৃত আশ্রয়ে। মাঝে মাঝেই তাদের জল খেতে হয়। আর এই বাঘের পায়ের ছাপ থেকে প্রমাণ হয়ে যায়, জলের নিকট কোমল ঘাসভরা তার সেই বিশ্রামের নিভৃত স্হানটিতে সে যখন আরামে শুয়ে, লোকটি এসে ঘাস কাটতে হাজির হয় ঠিক সেইখানেই,

বাঘও বিরক্ত হয়, তাকে মারে। এমনভাবে বিশ্রামকালে বিরক্ত করলে মানুষও কি প্রতিবাদ করে না? কিন্তু, প্রশ্ন ওঠে, বাঘটা তো এখন মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে, তার কি আর অন্য খাদ্যে রুচি ফিরবে?

প্রখ্যাত বাঘশিকারী জিম্ করবেটের অভিমত, বাঘরা স্বভাবত নরখাদক নয়, রেগে গিয়ে বা বিরক্ত হয়ে মানুষ মারে, অথবা বার্ধক্যের জন্যে বা কোন কারণে আহত বা অকর্মণ্য হয়ে পড়ায় যখন বন্য জীবজন্তু সহজে ধরতে বা মারতে অক্ষম হয়, তখনি সে অন্য খাদ্যাভাবে মানুষ মেরে খেতে শুরু করে। একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পেলে তখন মানুষখেকোই হয়ে পড়ে।

দুধ্ওয়ার সেই বাঘটি কিন্তু সুস্থ সবল। তার বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটায় তার প্রথম মানুষ শিকার। কিন্তু তার পরও সে তিন তিনটে মানুষ মেরে খেয়েছে। তবুও কি তাকে না মেরে থাকতে দেওয়া উচিত?

অর্জুন সিং ও রামলক্ষ্মণ সিং পরামর্শ করে ঠিক করেন, দেখাই যাক না, মানুষের রক্তের স্বাদ পেলেও এর নরমাংসলোলুপতা ভোলানো যায় কিনা।

বাঘটাকে বনের এমন অঞ্চলে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে মানুষ আর না যেতে পারে এবং তার স্বাভাবিক খাদ্য বন্য অন্য জীবজন্তু যথেষ্ট আছে। তবুও, তার যাতে খাদ্যাভাব বোধ না

জাগে ও নরহিংসা ভোলাবার জন্যে সেখানে প্রথম দিকে নিয়মিত পশুমাংস জোগান দেওয়া হতে থাকে। তারপর ক্রমশ তা কমিয়ে দিয়ে ও পরে বন্ধ করে দেখা গেল, মানুষ শিকারের লোভে সে আর বাইরে কোথাও যায় না, তার স্বাভাবিক বনের খাদ্যেই সে পরিতুষ্ট। করবেটের সিদ্ধান্তের এটা একটা ব্যতিক্রম দেখা যায়।

তবে, এভাবে বনের নরখাদক সব বাঘের জন্যে খাদ্যের ব্যবস্থা করা তো সম্ভব নয়। আর, ন্যাশনাল পার্ক এলাকার বাইরেও রিজার্ভ ফরেস্ট - সংরক্ষিত বন—আরও রয়েছে। সেখানেও বাঘের বাস আছে। তবে লোকজনের বনে প্রবেশ বা কাঠ কাটা ইত্যাদির বাধানিষেধ এই পার্কের মতন অতো কড়াকড়ি নয়, নিকটে লোকজনের চাষবাসও আছে। ফলে, লখিমপুর-খেরীর ঐ সব অঞ্চলে বাঘেদের উপদ্রব চলতে থাকে, মানুষও মাঝে মাঝে প্রাণ হারায়, বাধ্য হয়ে মানুষখেকো বাঘদেরও গুলি করে মারতে হয়।

॥ ৩ ॥

পথের ধারে মোটর দাঁড়ায়। কী ব্যাপার? ওঃ! সামনেই রেল লাইনের লেভেল ক্রশিং গেট বন্ধ। অমরনাথ বলেন, মৈলানী এসে গেল! এটা জংশন স্টেশন। দুধ্‌ওয়া যেতে লখ্‌নউ থেকে মিটার গেজ লাইনের ট্রেনে এসে, এখানে বদল করতে হয়। এখান থেকে শাখা লাইন দুধ্‌ওয়া গিয়েছে। এতক্ষণ আমরা এলাম উত্তর-পশ্চিম মুখে, এবার যাব উত্তর-পূবে—অর্থাৎ হিমালয় অভিমুখে। দুধ্‌ওয়ার জঙ্গল তো সেই পাহাড়তলিতে—তরাই-এ। আর কিছুক্ষণ পরেই সারদা নদীর পুল পার হব।

আমি বলি, তা হলে আমাদের গন্তব্যস্থানও আর বেশি দূর নয়। —ঐ ট্রেন পাস করে গেল, গেট্‌ও খুলবে। বাকি পথটা আমাদের যেতে যেতে তোমার জঙ্গলের ইতিহাসটা শেষ করো।

অমরনাথ বলে, শেষ কি আর করা যায়? সেখানে গিয়ে জঙ্গলটা দেখুন, তখন আরও শুনবেন। তবে, এতোক্ষণ শুধু দুধ্‌ওয়ার বাঘেরই গল্প করলাম, কিন্তু ঐ বনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে,—বিশেষ এক শ্রেণীর হরিণ—swamp deer—বারশিঙ্গা—স্থানীয় লোকেরা

বলে—গোন্‌ড্‌। এদেরই সংরক্ষণের জন্যে এই বনকে জাতীয় অভয়ারণ্য ঘোষণা করা।

এই জাতীয় হরিণ—ভারতের বাইরে আর কোথাও দেখা যায় না। নেপালের দক্ষিণাঞ্চলে, উত্তরপ্রদেশের ও আসামের তরাই-এ এবং সুন্দরবনে এদের দেখতে পাওয়া যায়। জলা জায়গায় এদের বাস। জলা ছেড়ে বড় একটা বার হয় না। তাই ইংরেজিতে এদের নামও swamp deer—জলচর বা জলা হরিণ। লাতিন নাম—Cervus duvauceli duvauceli Cuvier। বারশিঙ্গা নামকরণেরও কারণ আছে,—এদের প্রকাণ্ড শিং-এর শাখা-প্রশাখার সাধারণত বারোটা সুচাল ডগা,—অবশ্য তার বেশি বা কমও যে হয় না তা নয়।

এক কালে এই সব তরাই অঞ্চলের জলাভূমিতে হাজার হাজার এই বারশিঙ্গা হরিণ ছিল। লোকবসতির জন্যে অনেক জলাভূমি ভরাট করে ফেলা হোল, আবার তরাই অঞ্চলে উদ্বাস্তুরাও এসে বসবাস ও চাষ আবাদ শুরু করল। এই ভাবে লোকালয় গড়ে ওঠার ফলে বারশিঙ্গা হরিণরাও তাদের বাস্তুভিটাহারা হয়ে গেল। তার ওপর উদ্বাস্তু চাষীরা হরিণ শিকারের তাণ্ডব লীলাও শুরু করল। বহু সংখ্যক বারশিঙ্গা এই দুধ্‌ওয়ার জঙ্গলে পালিয়ে আসে।

এইভাবে এদের বংশলোপের আশঙ্কা দেখা দেওয়ায় বিলি অর্জুন

সিং-এর চেষ্টায় এরা সংরক্ষিত প্রাণী এবং এই বন দুধ্‌ওয়া অভয়ারণ্য বলে ঘোষিত হোল। সারা ভারতে হাজার চারেক বারশিঙ্গা আছে, তার মধ্যে ১৯৮২ সালের গণনায় দেখা গেছে ২৬০০ দুধ্‌ওয়াতেই থাকে। ভারতের আর কোথাও বারশিঙ্গার এমন বিরাট সমাবেশ দেখা যাবে না।

আমি বলি, তাহলে দুধ্‌ওয়ার বাঘের প্রসিদ্ধি হলেও তার প্রকৃত খ্যাতি বারশিঙ্গার জন্যেই।

অমরনাথ জানান, প্রসিদ্ধির আরও এক কারণ সম্প্রতি ঘটেছে। ওখানে গণ্ডারও এখন দেখবেন।

আশ্চর্য হই। যুক্তপ্রদেশের জঙ্গলে গণ্ডার আছে, জানতাম না ত'।

অমরনাথ বলে, এককালে দুধ্‌ওয়ায় ছিল। এখানকার শেষ গণ্ডার প্রাণ হারায় প্রায় একশ' বছর আগে। মানুষ হচ্ছে বন্যজীবজন্তুর প্রধান শত্রু। গণ্ডারের খড়্গ থেকে আরম্ভ করে পায়ের নখর পর্যন্ত সর্বাঙ্গের প্রতি মানুষের লুব্ধ দৃষ্টি। নানান্ কাজে ব্যবহার করে। খড়্গ থেকে কী এক ওষুধ হয় বলে বিশ্বাস। গণ্ডার শিকার করে তাদেরও বংশলোপের উপক্রম দেখা দেয়।

এককালে আসামের কাজিরাঙ্গায় ও নেপালে এবং হিমালয়ের তরাই-এর কোন কোন অঞ্চলে প্রচুর গণ্ডারের বাস ছিল। এখন

নেপালের কিছু অংশে, কাজিরাঙ্গায় ও জলদাপাড়ায় যা কয়েকটা রয়েছে। তাই দুধ্‌ওয়াতে গণ্ডারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা হচ্ছে।

ঠিক দু বছর আগে ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে, আসামের জঙ্গল থেকে প্লেনে করে পাঁচটা গণ্ডার—দুটা মদ্দা, দুটা গাভিন মাদি ও একটা বাচ্চা মাদি—দিল্লীতে আনা হয়। তারপর সেখানে সপ্তাহখানেক বিশ্রামের পর ট্রাকে করে তারা দুধ্‌ওয়ায় পেঁছিয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত গাভিন গণ্ডার দুটোই পাঁচমাসের মধ্যে মারা গেল—হয়ত এই দীর্ঘযাত্রার ধকল সইতে না পেরে।

কিন্তু, এই নিয়েই এক সোরগোল ওঠে, দুধ্‌ওয়ার জঙ্গলে নাকি গণ্ডারদের থাকার অনুকূল পরিবেশ নেই! গণ্ডারদের বাস হচ্ছে তাজা সবুজ ঘাসের জঙ্গলে। তাছাড়া জলকাদারও তাদের একান্ত প্রয়োজন।

প্রশ্ন ওঠে, এ-সব কি দুধ্‌ওয়ার জঙ্গলে আছে? জলাভূমি রয়েছে, ঠিক, কিন্তু ঘাস?

পরিবেশ সম্বন্ধে সরাসরি কোন তর্কে যোগ না দিয়ে আমি ঠিক করলাম, দুধ্‌ওয়ায় ঘাসের জমির সংস্থান কিরকম বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সার্ভে করে দেখানো যাক্ না।

Ecologist সি. এস্. মিশ্রের সহযোগিতায় সেই মত সার্ভে করে এক প্রবন্ধ প্রকাশ করা হোল বনবিভাগের Indian Forester

পত্রিকায়। তাতে দেখান হল দুধ্‌ওয়ার বনে সব রকম আবহাওয়া রয়েছে। কতো বিভিন্ন জাতির ঘাসের জঙ্গল আছে তারও বর্ণনা ও পরিমাপ দেওয়া হোল। দুধ্‌ওয়ার জঙ্গলের এও এক বৈশিষ্ট্য। একই জঙ্গলের মধ্যে রয়েছে প্রাকৃতিক কতো ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ।

হিমালয়ের তরাই অঞ্চল, তাই ভূভাগ উঁচু থেকে ক্রমশ নিচের দিকে নেমে আসে। তা ছাড়া পাহাড়ী অঞ্চল, উচ্চাবচ ভূমি ত' হবেই। তারই মধ্যে দিয়ে বয়ে চলে হিমালয় থেকে নেমে-আসা ছোট ছোট নদী ও জলধারা—এই কারণে এই ৬১৩ বর্গ কি. মি. বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল পলিজ জমি····নরম মাটির স্তর। এরই মাঝে কোথাও ঝিলও আছে—স্থানীয় ভাষায় 'তাল'।

জঙ্গলের রূপও বৈচিত্র্যময়। কোথাও বড় বড় শালের বন, কোথাও নানারকম জংলী গাছগাছড়ার গহন বন। কোথাও আবার 'সাভানা' —তৃণাকীর্ণ উন্মুক্ত প্রান্তর—তারই বুকে মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে কয়েকটা গাছ, আবার কোন অঞ্চলে বিস্তীর্ণ জলাভূমি।

আর বনের সর্বত্রই ঘাস—নানান্ জাতির। কোথাও ৭/৮ ফুট উঁচু ঘাস, কোথাও বা কচি কোমল ঘাসের যেন গালিচা পাতা। শালবনের নীচে এক ধরনের ঘাস, খোলা মাঠে আর এক রকম, জলাভূমিতে বা নদীনালা তালাও-এর ধারে ভিন্ন প্রকৃতির।

নদীর চরের বুকে গজিয়ে ওঠা ঘাস—তারও এক ভিন্ন জাতি।

শুধু জাতির পার্থক্যই নয়, ঘাস জন্মায়ও পর্যাপ্ত।—এই সব প্রমাণ দেখেই গণ্ডার পুনর্বাসনের কাজ পূর্ণ উদ্যমে এগিয়ে চলে।

যে দুটা মদ্দা গণ্ডার ১৯৮৪ সালে আসাম থেকে আনা হয়

তাদের সঙ্গিনী সংগ্রহের আয়োজন হয়। নেপালের রয়াল চিটাওয়ান পার্ক থেকে চারটে মাদী গণ্ডার আমাদের এখানকার ১৬টা হাতির প্রতিদানে নিয়ে আসা হয়।

আমি হেসে জিজ্ঞাসা করি, এই-আন্তর্জাতিক মিলনে পারিবারিক শান্তি বজায় আছে ত ?

অমরনাথও হাসে। বলে, গিয়ে দেখবেন। দুটি মাদী গণ্ডার ইতিমধ্যে গাভিন হয়েছে। ভালয় ভালয় বাচ্চা প্রসব করলে ও সেগুলি বাঁচলে বনবিভাগের মস্ত কৃতিত্ব। মাদীদের নাম রাখা হয়েছে—স্বয়ংবরা, নারায়ণী, হিমরানী ও রাপ্তা।

মন্দা দুটির নাম রাখা হয়নি ?

হয়েছে বই কী। রাজু ও বাঙেক। আসামের সেই বাচ্চা গণ্ডারও এখন বড় হয়েছে, তারও কি-একটা নাম হয়েছে। এখন দুধ্‌ওয়ায় সাতটা গণ্ডার !—দাঁড়ান, গাড়িটা একবার দাঁড় করাই। পাশেই ঐ বনের ধারে আমাদের কাঠগুদামটা ইনস্‌পেকসন করে যাই।

রাস্তার ধারে গেট আসে। মোটর সেইদিকে ঘুরে দাঁড়ায়। ড্রাইভার হর্ন দেয়। চৌকিদার গেট খোলে। গাড়ি এলাকার মধ্যে ঢোকে। ভেতরের লোকজনের মধ্যে সাড়া পড়ে যায়। 'সাহাব আয়া'! কর্মকর্তারা ছুটে আসেন।

তারের বেড়াঘেরা বিরাট এলাকা। কয়েকটা কাঠের বাংলো। স্তূপাকার কেটে আনা গাছের গুঁড়ি। একপাশে কাঠ চিরে তক্তা তৈরি করার টিনের প্রকাণ্ড শেড্‌। আগে ব্যবসায়ীদের কাছে বনের

অংশ জমা দেওয়া হোত। তারা সেখান থেকে গাছ কেটে নিয়ে যেত। এখন সে-নিয়ম নেই। বনদপ্তরের তত্ত্বাবধানে গাছ কেটে এনে এই ধরনের কাঠের গুদামে জড় করা হয়। এখান থেকে ব্যবসাদাররা কেনেন।

অমরনাথের কাজ শেষ হলে আবার রওনা। অমরনাথ বলেন, এইসব অঞ্চলেও এককালে ঘোর জঙ্গল ছিল। এখন জঙ্গলের অনেক অংশ কেটে সাফ করে লোকবসতি হয়েছে, চারপাশে চাষবাসও হচ্ছে। তবু, মাঝে মাঝে খানিক বনের অংশ রেখে দেওয়া হয়েছে—বনদপ্তরের তত্ত্বাবধানে। আর একটু এগিয়ে গেলেই আমরা সারদা নদী পাব।

॥ চার ॥

কিছুক্ষণের মধ্যেই সারদা নদীর পুল আসে। সারদা এ অঞ্চলের বড় নদী। নদীর বুকে চড়া পড়তে শুরু হয়েছে। অপর পারে পেঁাছে গ্রাম বড় একটা দেখা যায় না। শুষ্ক ঊষর জঙ্গলাকীর্ণ প্রান্তর। মাঝে মাঝে ছোট পাহাড়। হঠাৎ যেন তারই মাঝে জেগে ওঠা লোকালয়। কয়েকটা দোকানপাট, বাজার। অমনরাথ তার চাপরাসীকে বলে, পালানি এসে গেল? এখানে কিছু সবজি কিনে নাও—দু দিনের মত। বনে ঢুকে ত আর কিছু পাবে না।

মোটর দাঁড়ায়।

অমরনাথ বলেন, দুধ্‌ওয়া আর মাইল পাঁচেক মাত্র। বনে থাকতে হলে এই লোকালয় থেকেই যা কিছু বাজার করে নিয়ে যাওয়া।—তারপর চাপরাসীকে বলে, একটা দোকানে বলে যাও, কাল সকালে এসে দই নিয়ে যাবে, যেন রেখে দেয়। মোটরে এইটুকু পথ যেতে আসতে কতটুকুই বা সময় লাগবে। মিষ্টি নেবার দরকার নেই, সঙ্গে এনেছি।

বাজার সেরে আবার যাত্রা। আবার একটা নদী। নাম শুনি সুহেলী। অমরনাথ জানায়, এইটেই যেন বনের এদিকের পরিখা।

পৌঁছে যাই জঙ্গল অঞ্চলে। অভয়ারণ্য শুরু হবার কিছু আগে রেলের ছোট স্টেশন—দুধ্‌ওয়া। বন্দোবস্ত করলে বনদপ্তরের জীপ এসে এখান থেকে যাত্রীদের বনের ভিতর নিয়ে যায়। অমরনাথ জানায়, দুধ্‌ওয়া জংশন স্টেশন। একটা লাইন চলে গেছে উত্তর পশ্চিমে বনের সেদিকের শেষ প্রান্তে গৌরীফাটায়,—নেপাল সীমান্তে। আবার অপর দিকে উত্তর পূবে আর একটা লাইন গেছে বনের সেদিকের শেষ সীমানায়—চন্দনচৌকীতে। তারপরই সেখানেও নেপাল রাজ্য।

মোটর প্রবেশ করে পার্ক এলাকায়। প্রথমে কিছুদূর বিস্তীর্ণ মাঠ। এবড়োখেবড়ো পাহাড়ী জমি, তারপরেই প্রকৃতির রূপসজ্জার পরিবর্তন। চারিপাশে মাথা তুলে বড় বড় গাছ—অধিকাংশই শাল।

অল্প যেতেই পথের ডান দিকে খোলা জায়গা। কেয়ারি করা ফুলের বাগান। মাঝে রাস্তা। অদূরে দোতলা পাকা বাড়ি। আশপাশে

ছড়ানো ছোট ছোট কটেজ। মাঠের ওপর কয়টা তাঁবু খাটানো। পরিপাটি সাজসজ্জা প্রমাণ দেয়, স্হানীয় বনদপ্তরের কেন্দ্র ও এখানকার

প্রধান বনবিশ্রাম ভবনের এলাকা। বড় গেট-এ তালা বন্ধ। ড্রাইভার মোটর দাঁড় করিয়ে হর্ণ বাজায়। অমরনাথ তখনি নিষেধ করেন, বনের মধ্যে হর্ন বাজায় না। গাড়ী ঘুরিয়ে ওপাশের ঐ গেটটায় চল, খোলা আছে নিশ্চয়।

ঠিক তাই। সেইদিক দিয়ে এলাকায় ঢোকা হয়। অল্প এগিয়ে সেই দোতলা বাংলো। ফরেস্ট রেস্ট হাউস। কর্মচারীরা এসে হাজির হয়। পরিচ্ছন্ন ঝকঝকে বাংলো। দোতলায় আমাদের থাকবার ব্যবস্থা। কার্পেট বিছানো সব ঘর। নরম গদী-অলা সোফা সেট দিয়ে সাজানো বড় ড্রয়িং রুম। ছিমছাম পরিবেশ। পাশে শোবার ঘর। খাটে ধবধবে বিছানা। লাগোয়া স্যানিটারি বাথরুম। বাড়ির মধ্যে ঢুকে মনেই হয় না কোন গহন অরণ্যে এসে রয়েছি। এযেন কোন শহরের শৌখিন বিলাসভবনে আতিথ্যগ্রহণ! দীর্ঘ পথ একটানা মোটরে এসে খাটের পাশে চেয়ারে বসি। ক্লান্ত দেহ আরাম বোধ করে। মন কিন্তু স্ফূর্তি পায় না, বনে এসেও এভাবে এতো আরাম সে যেন চায় না।

অরণ্যদেব কী মনের সে ভাষা বোঝেন? দরজার বাইরে থেকে অমরনাথের মৃদু কণ্ঠে প্রশ্ন শুনি, এখন ছ'টা বেজেছে। এখনও বেলা একটু রয়েছে। জীপ-এ বনের মধ্যে এক চক্কর ঘুরতে যাবেন? তাহলে এক কাপ করে চা খেয়ে এখনি বেরুতে হয়।

মন উৎফুল্ল হয়ে ওঠে।- "খুব রাজি" বলে তখনি ঘর থেকে বেরিয়ে আসি। বাইরে খোলা বারান্দায় চেয়ার টেবিল পাতা। চায়ের সাজসরঞ্জাম সাজানো। বনদপ্তরের দুজন স্থানীয় অফিসারও এসেছেন। আলাপ পরিচয় হয়।

চা খেতে খেতে অমরনাথ তাঁদের জানান, কাল সকালে এঁকে নিয়ে আবার জীপে বন ঘোরা যাবে ভাল করে। সকাল সাড়ে পাঁচটায় তৈরি থাকব। ঘণ্টা তিনেক ঘুরে, ফিরে এসে নটার সময় এখানকার কাজকর্ম দেখতে বেরুব।—না, না, আমাদের খাওয়া দাওয়ার বিষয়ে আপনাদের ভাবতে হবে না, কোন ব্যবস্থা করারও দরকার নেই। আমার সঙ্গে যে লোকটি এসেছে, সেই সব করবে, জিনিসপত্রও সব সঙ্গে এনেছে।

নেমে এসে জীপ-এ তখনি বার হই। মনে অশেষ কৌতূহল। বেলাশেষে বনের মধ্যে কতো কী জন্তু দেখা যাবে। আর ৭০টা বাঘ এখানে,—কমলাকান্তের সেই বাঘের সভাই হয়ত দেখব! কিন্তু ঘণ্টাখানেক ঘুরে কয়েক দল চিতল হরিণ ছাড়া আর কোন জন্তু দেখা গেল না।

দেখলাম, বেলা শেষের ম্লান ছায়ায় বনভূমি ঘিরে আসে। থমথমে ভাব। চারিদিকে গভীর অরণ্যের নিস্তব্ধতা, তারই মাঝে কোথাও কোন গাছের মাথায় নীড়ে ফেরা পাখিদের কলগীতির ঐকতান।

বনের জীবজন্তু দেখা গেল না ঠিকই, কিন্তু বনদেবতার সুস্নিগ্ধ স্পর্শে মন প্রফুল্ল হোল।

বাংলোয় ফিরে আবার ছাতে চায়ের টেবিলে বসা। চারিদিক শান্ত নিঃস্তব্ধ। রাত্রি নামছে। হঠাৎ বন থেকে ভেসে আসে কাকর মৃগের ডাক।

বলি, বাঘ বেরিয়েছে বোধ হয়। এখানে রাত্রে বনে ঘুরে দেখার ব্যবস্থা নেই—স্পট লাইট নিয়ে? যেমন পালামৌর জঙ্গলে ঘুরেছিলাম।

অমরনাথ বলে, না। ওভাবে ঘোরাঘুরিতে বন্য জীবজন্তুদের বিরক্তির কারণ ঘটে। ন্যাশনাল পার্কে রাত্তিরে ঘোরা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। বনের মধ্যে কারও প্রবেশই নিষেধ। তা ছাড়া, এখানে বাঘের সংখ্যা বেশি, তাই বিপদের আশঙ্কাও আছে। এই তো কদিন আগে একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। এক রেঞ্জার সন্ধ্যার পর কী কারণে বনের মধ্যে যায়। সারারাত আর ফেরেনি। পরদিন খোঁজাখুঁজি করতে বার হয়ে দেখা গেল, বাঘ ঝোপের মধ্যে বসে তার মৃতদেহ আহার করছেন। বাঘটাকেও গুলি করে মারতে হয়।

রাত্রিবেলাতেই বনের এই সব প্রাণী বেশি ঘোরে ফেরে, শিকার ধরে—সে সময়ে তাদের কোন রকম বিরক্তির কারণ ঘটাতে নেই, ন্যাশনাল পার্কের প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে, বন্যপ্রাণীরা যাতে তাদের

স্বাভাবিক পরিবেশে থাকতে পারে, স্বাধীনভাবে ঘুরতে পারে, সেইমত ব্যবস্থাদি করা।

দিনের বেলাতেও সব আইনকানুন আছে, বেশি শব্দ করা, এমন কি ট্রানজিস্টার-আদি বাজানোও বারণ। বনের শান্তি কোনোমতেই যাতে বিঘ্নিত না হয়, তারই জন্যে এই সব কড়াকড়ি। কিন্তু—

অমরনাথ কি বলতে গিয়ে থেমে যান। কৌতূহলী হই। প্রশ্ন করি, "কিন্তু" বলে থামলে যে, কথাটি শুনি।

সঙ্কোচ ভরে জানায়, সেটা একটা একবারের লজ্জাজনক ঘটনা। সে সময়কার মুখ্যমন্ত্রী আসবেন এই বন দেখতে। বললেন, হেলিকপটারে যাব। তাঁকে জানানো হোল, বনের মধ্যে হেলিকপটার-এ নামা, বা বনের ওপর ঘোরা নিষেধ। তবুও, তিনি সেইভাবে এখানে এলেন, আর তাই চড়ে বনের মাথার ওপর ঘুরলেনও! কী দেখলেন, আর এতে কী পেলেন, তিনিই জানেন।

আমি বলি, এই সব ন্যাশনাল পার্কে থাকবার যা রাজকীয় ব্যবস্থাদি করা হয়, তাইতেই ভি আই পি রা কেউ কেউ আকৃষ্ট হন, অবাঞ্ছিত ট্যুরিস্টেরও অতো ভিড়। যাঁরা প্রকৃত অরণ্যপ্রেমী, তাঁরা আসেন সত্যিই বন দেখতে, আরাম বা স্ফূর্তির লোভে নয়। বনে থাকার জন্যে সভ্যজগতের মানুষের যেমন যতটুকু প্রয়োজন, মাথা গোঁজবার সেইটুকু ব্যবস্থা রাখার বন্দোবস্থ করলে অবাঞ্ছিত লোকজনদের

আসাও কমে যায়।

অমরনাথ হাসে। মন্তব্য করে, কর্তারা তাতে রাজি হবেন কেন? মর্যাদার প্রশ্ন আছে যে!

আমি বলি, কাল সকালে বনে ঘোরা হবে, কী কী জানোয়ার এ বনে আছে শুনি।

অমরনাথ বলে, ওঃ! এখানকার প্যামফ্লেটটা পাননি বুঝি? ঘরের টেবিলে একটি কপি রয়েছে দেখলাম, এনে দিই।—উঠে গিয়ে এনে দেয়।

তাইতে ১৯৮২ সালের সেনসাস অনুযায়ী জীবজন্তুর আনুমানিক সংখ্যার তালিকা পাই ঃ

বাঘ—৬৫ ; লেপার্ড—১০ ; বারশিঙ্গা—২,৬০০ ; চিতল হরিণ—৯,৮০০ ; হগ্ ডিয়ার—২,১৫০ ; কাকর মৃগ (বার্কিং ডিয়ার)—৬৭৫ ; শম্বর—৫৬০ ; হাতি—৫ ; শ্লথ ভালুক—৬৫ ; নীলগাই—৬০০ ; বন্য শূকর—৩,৩০০ ; কৃষ্ণসার মৃগ—২০ ; ভোঁদড়—১৫ ; মেছো কুমীর—৬ ; এছাড়া নানাজাতির সাপ তো আছেই, বিশাল অজগরও। আর আছে বিভিন্ন রকমের পাখি।

আমি জিজ্ঞাসা করি, হাতি এখানে মাত্র পাঁচটা?

অমরনাথ জানায়, ন্যাশনাল পার্ক এলাকায় এখন হাতি নেই বললেই হয়। আগে কয়েকটা দল ছিল, ১৯৭৯ সালের গণনার সময়েও ৪১টা

দেখা যায়। তারপর, তারা অন্যত্র চলে গেছে। হাতিরা তো ঐভাবে বন থেকে বনান্তরে ঘুরে বেড়ায়। আপনার ঐ তালিকায় বাঘ—৬৫ লিখেছে, এখন বেড়ে গিয়ে ৭০ হয়েছে। অন্য জানোয়ারও কম বেশি হয়েছে। গণ্ডারেরও ওতে উল্লেখ নেই, পরে এসেছে। এখন সাতটা গণ্ডার রয়েছে।

আমি মন্তব্য জানাই, এইবার হাতিদের এ-বন ত্যাগ করার কারণ ধরতে পারলাম। তুমি বলেছিলে. এখানকার ১৬টা হাতির বিনিময়ে নেপাল থেকে চারটে মাদী গণ্ডার এখানে আনা হয়। হাতিরা অতি বুদ্ধিমান প্রাণী। তারা তাদের অমন অপমান সইবে কেন? এ-বন ছেড়ে চলে গেল। যাক, কাল কাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, দেখা যাবে।

॥ পাঁচ ॥

পরদিন। সকাল সাড়ে পাঁচটায় জীপে যাত্রা। সঙ্গে রেঞ্জারও চলেছে গাইড হয়ে। দুজন বন্দুকধারী বনরক্ষীও আছে। জীপ প্রবেশ করে গভীর শাল বনে।

পথের দুপাশে বড় বড় গাছ। আকাশপানে সোজা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, ডালপাতার ফাঁকে ফাঁকে নীল আকাশ উঁকি মারে। সেই বনভূমি ভেদ করে পথ চলে গেছে সোজা; বহু-দূরে, যেন তার শেষ দেখা যায় না। পথ ছেয়ে আছে শালের শুকনো ঝরা পাতায়। লালচে রঙ। অথচ, পথের দুপাশের বনে সবুজের বন্যা। সুঠাম দীর্ঘদেহী শালগাছগুলির মাথাভরা সবুজ পাতার আচ্ছাদন। অথচ, নিরাবরণ ঋজু দেহ।

নীচে বনতলে আবার গাছের গুঁড়ির চারপাশে লতাগুল্মের ঘন সবুজ জঙ্গল। তারই বুকে মাঝে মাঝে লাল, সাদা হলদে জংলীফুলের অঙ্গরাগ। গভীর বন। কিন্তু, অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়।

সকালের রোদ গাছের ফাঁকে ফাঁকে এসে সেই সবুজ বনে আলোর ঢেউ তোলে। রক্তিম পথের বুকে গাছের গুঁড়ির ছায়া ফেলে। সারি সারি আলোছায়ার সরল রেখা আঁকে। প্রাণিশূন্য নির্জন বনানী। গভীর অরণ্যের বিভীষিকা নয়, স্নিগ্ধ শান্তিময়, "শ্যামল দাক্ষিণ্যে ভরা"। যেন, কোন ঋষির তপোবন।

জীপ এগিয়ে যায়। শালবন শেষ হয়। পথের দুপাশে কী সব গাছের ঘন বন। পথের মাথার ওপর শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে পরস্পরে স্পর্শ করে। যেন, সুড়ঙ্গ পথের সৃষ্টি হয়। কেমন যেন আলোছায়া মেশানো ছমছমে আবহাওয়া।

রেঞ্জারের ইঙ্গিতে ড্রাইভার জীপ থামায়। আবার কিছুটা পিছনে নিয়ে যেতে ইশারা করেন। গাড়ী ছেড়ে রেঞ্জার ও বনরক্ষীরা নামে। আমাদেরও নামতে ইঙ্গিত করেন। মনভরা পুলকিত কৌতূহল। কী দেখা যাবে? বাঘ নাকি? রেঞ্জার আঙুল তুলে সতর্ক করেন, কোন কথা নয়, চুপ। এদিক ওদিক তাকাই। কোথায়? কোনদিকে? কী-ই?

রেঞ্জার পথের ওপর পায়ের ছাপ দেখান। বাঘেরই! সদ্য এখান দিয়ে চলে যাওয়ার টাটকা ছাপ। এই যে, এখানে ডান পাশের বন থেকে বার হওয়া। তারপর রাস্তা ধরে চলা। আমরাও চলি সেই পদচিহ্ন ধরে। ধীরে ধীরে। ঢিপ ঢিপ করে বুক।

জীপ দাঁড়িয়ে থাকে। সুমুখে পথের দিকে তাকাই। সেদিকে তাকে দেখা যায় না। তবে কি এগিয়ে গিয়ে হঠাৎ দেখা যাবে পথের ধারে ঝোপে বসে রয়েছে! মনে অদ্ভুত উৎকণ্ঠা। দল বেঁধে যাওয়া, ভয় নেই, শুধু প্রচণ্ড ঔৎসুক্য। আরও খানিক এগিয়ে গিয়ে পায়ের ছাপ বেঁকে পথ ছেড়ে বাঁদিকের বনে ঢোকে। সবাই সেদিকে উঁকিঝুঁকি মারি, জঙ্গলের ভেতরে যতটুকু দেখা যায়। না, সেখানে নেই। যাঃ, চলে গেছে। স্বস্তির নিঃশ্বাস, না, হতাশার দীর্ঘশ্বাস, কে জানে!

আবার মোটরে উঠে বসা। এগিয়ে চলা। কিছুদূর গিয়ে আবার শালবন। বনের ধারে ফাঁকা একফালি মাঠ। ঘাসে ছাওয়া। একপাল হরিণ। চিতল (spotted deer)। চরে বেড়াচ্ছে। গায়ের ওপর ফুটকি ফুটকি সাদা দাগগুলি রোদ লেগে চিকমিক করে। জীপের শব্দে চমকে ওঠে। সবাই একজোট হয়। মাথা তুলে কান খাড়া করে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

ধীরে ধীরে জীপ পথ ধরে এগিয়ে যায়। আবার বন। খানিকদূর গিয়ে এবার সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর। মাঠে বড় বড় ঘাস। মাঝে মাঝে দু একটা বড় গাছ। প্রচুর হরিণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ঘুরে বেড়ায়। চিতলের চেয়ে আকারে বড়। বড় বড় শিং-ও।

অমরনাথ জানান, ঐ হোল বারশিঙ্গা-গোন্ড-swamp deer। এ

মাঠটা জলাভূমি। আপনাকে আগেই বলেছি, এরাই হল এ-বনের বৈশিষ্ট্য। ভারতের বাইরে আর কোথাও এ-জাতের বারশিঙ্গা হরিণ দেখা যায় না। আর সারা ভারতে দুধ্‌ওয়ার মত এত সংখ্যক বারশিঙ্গা আর কোথাও নেই।

আমি বলি, অনেকটা শম্বরের মত বড় দেখতে।

অমরনাথ বলে, দেখায় বটে সেইরকম, তবে তাদের চেয়ে আকারে কিছু ছোট। জীপ এখানে থাক, হেঁটে চলুন মাঠের ধারে ঐ দিকে, বড় গাছটার ওপর 'ওয়াচ টাওয়ার'-মাচান আছে। উঠে দাঁড়িয়ে দেখবেন। দূরবীন এনেছি।

ডালপালা ছড়ানো বিরাট গাছ। কাঠের ধাপ বেয়ে গাছের বেশ খানিক ওপরে উঠি। ডালপালার মধ্যে কাঠের মঞ্চ—ঘরের মত।

দূরবীন দিয়ে দেখি। কতোগুলো? শ'খানেক তো হবেই। গায়ের রঙ বাদামী। কারও কারও যেন একটু গাঢ় রঙ। দু একটার গায়ে অস্পষ্ট ফুটকি দাগও মনে হয়। ছোট ছোট পশমী লোমে ভরা গায়ের চামড়া। মাথাগুলো প্রকাণ্ড। কোন কোনটার ডালপালা-অলা শিং।

অমরনাথ জিজ্ঞাসা করে, রঙের কিছু তারতম্য দেখতে পারছেন? হরিণীদের চেয়ে পুং হরিণের রঙ একটু গাঢ়। একটা বৈশিষ্ট্য আপনার দেখতে পাওয়া সম্ভব নয়, এদের পায়ের খুর। এই জাতের হরিণের খুর
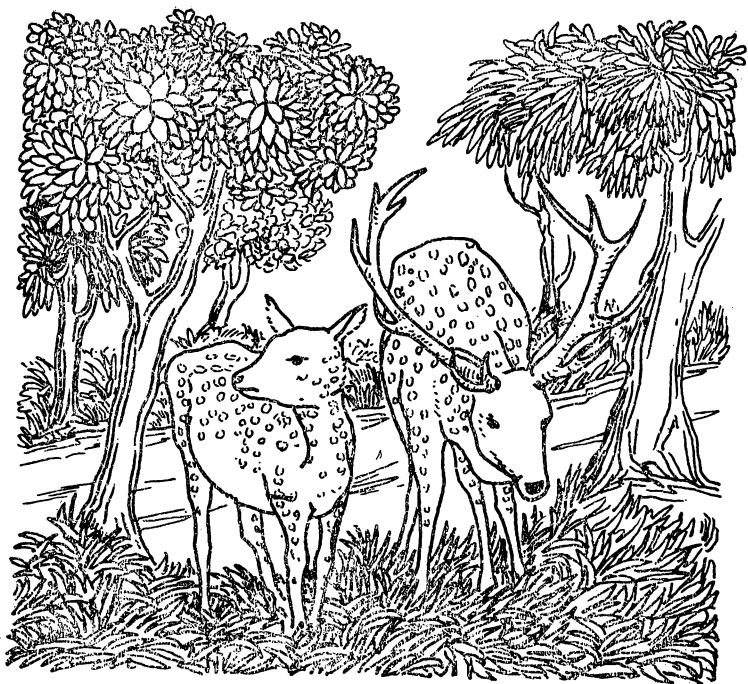
সাধারণ হরিণের মত নয়, চওড়া, কেমন যেন ছড়ানো, চেপটা-মতন।
তাইতে জলা জায়গায় ঘোরাফেরার সুবিধে, সাধারণ হরিণের মত

সূচালো খুর হলে জল কাদায় বসে যেত।

শুনে ভাবি, ভিন্ন ভিন্ন জীবদেহের আবশ্যক মত কী বিচিত্র স্বতন্ত্র সৃষ্টিরহস্য।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকি। কেমন আপন মনে চরে বেড়ায়।

অমরনাথ বলে, শম্বররা সাধারণত নিশাচর। রাত্রেই তাদের বেশি ঘোরাফেরা। বারশিঙ্গারা কিন্তু চরে দিনমানে, সকালে একটু বেলা হলে, আবার বিকালে সন্ধ্যার আগে পর্যন্ত। দুপুরে বিশ্রাম করে। এদের ঘ্রাণশক্তি বেশ প্রখর, সে তুলনায় শ্রবণ ক্ষমতা সাধারণ। আমরা দূর থেকে দেখছি, না হলে দেখতেন কাছাকাছি গেলে ভয় পেয়ে দলকে দল তখনি পালাত—তীক্ষ্ম ডাক ছেড়ে। শুনেছি, এদের মাংস নাকি সুস্বাদু। তরাই-এর উদ্বাস্তু চাষীরা তো এককালে এদের শিকার করে প্রায় বংশলোপ করে দিচ্ছিল। এখন সংরক্ষিত বনে আশ্রয় পেয়ে নির্বিবাদে রয়েছে, সংখ্যাবৃদ্ধিও হচ্ছে।

আরও কিছুক্ষণ দেখে গাছের ওপর থেকে নেমে আসা হয়।

রেঞ্জার বলেন, এবার চলুন, নিকটে ঐ দিকে একটা পাহাড়ী নদীর ধারে। অনেক সময় বাঘ ওখানে জল খেতে এসে জলের নিকটে শুয়ে বিশ্রাম নেয়, দেখা যাক, এখন আছে কিনা।

পাহাড়ী অঞ্চল। নদীর পাড় খানিক উঁচু। সেখানে উঠে দাঁড়াই।

নীচে ছোটধারা বহে চলে।

বালির চরে বাঘের পায়ের ছাপ। রেঞ্জার এখানেও দেখে বলেন, অল্প আগে ওপারে গেছে।

অতএব, এখন যাওয়া বনের আর এক প্রান্তে। সোনারিপুরের বন বিশ্রামভবন ছাড়িয়ে আর কিছুদূর গিয়ে জীপ থেকে নামা হয়। হেঁটে অল্প যাওয়া। জঙ্গলের মধ্যে ছোট নালা। পার হবার জন্যে দুটো কাঠ পাতা। ওপারে গিয়ে সুমুখে প্রকাণ্ড বিল। পাড়ে 'ওয়াচ টাওয়ার' মাচানঘর। ওপরে উঠে দাঁড়াই। জলের ওপর নানান পাখির আনাগোনা।

অমরনাথ জানান, এখানে পাখিরই রাজত্ব। জঙ্গলের আরও অনেক ছোট ছোট ঝিল আছে। সেখানেও পাখির ঝাঁক। দুধ্‌ওয়ার বনে প্রায় চারশ জাতের পাখির দেখা পাওয়া যায়। কিছু পরিযায়ী পাখিও আসে।

হঠাৎ ট্রেনের যেন আওয়াজ। তাকিয়ে দেখি, ঝিলের ওধারে দূরে ট্রেনই চলেছে।

রেঞ্জার জানান, জঙ্গলের ভিতর দিয়ে লাইনটা গেছে সেই নেপাল সীমান্তে—তারই গাড়ী চলেছে—চন্দনচৌকি। ছোট ট্রেন। দূরে থেকে আরও ছোট দেখায়। ইঞ্জিন থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী আকাশপানে ছড়িয়ে পড়ে। যেন, এই আদিম অরণ্যের বিরাট অজগর ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করে এগিয়ে চলে!

অমরনাথ বলে, চলুন, বনের ওদিকটাও আরও খানিক ঘুরে বাংলোয় ফেরা যাবে।

আবার জীপ ছোটে। কোথাও বনের গাছপালার জটলা। কোথাও খোলা মাঠ। কোথাও বা জলাভূমি। কখনও পাহাড়ী নদী। স্বচ্ছ জলধারা। জলের বুকে মাথা তুলে দু একটা পাথর, তার ওপর পাখি বসে, হয়ত মাছের লোভে। নদীর ওপর কাঠের চওড়া সেতু। জীপ

পার হয়ে আবার বনে ঢোকে।

অমরনাথ বলে, তরাই-অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার অতো প্রকোপ হওয়ার একটা কারণ, এখানে পাহাড় থেকে কতো নদী ঝরনা, জলধারা নেমে এসেছে, অথচ এটা পাহাড়ে উঁচু নীচু জায়গা, জলস্রোত কোথাও কোথাও আটকে, বিল, ডোবা এইসব সৃষ্টি করে। তাছাড়া বহতা নদী, ঝরনার বুকে অনেকসময় গাছের ডালপালা ভেঙে পড়েও জলস্রোত আটকে দেয়, জল জমে, পাতা পচে, মশার রাজত্ব বসে। এখন অবশ্য এ-সব বনে নদীর ধারা যথাসম্ভব বাধামুক্ত রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে।

বনের কোলে বিশাল উন্মুক্ত প্রান্তর আসে। সেখানে বেড়া-ঘেরা এলাকা। ছড়ানো ছিটান চালাঘর। আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করি, ন্যাশনাল পার্কের মধ্যে দিয়েই তো এখনও চলেছি আমরা? এখানে গ্রামের মতন? বনদপ্তরের ঘরবাড়ি তো মনে হয় না।

অমরনাথ জানায়, ওটা গ্রামই বটে। এ বনের মধ্যে শুধু এখানেই

নয়, কুমায়ুনের তরাই অঞ্চলেও এই রকম কতকগুলি গ্রাম আছে,—থারুদের।

"থারু? তারা আবার কি জাতি? এ অঞ্চলের এক শ্রেণীর আদিবাসী বুঝি?"

অমরনাথ জানান, আদিবাসী নয়, তবে এক শ্রেণীর উপজাতি। চার পাঁচ শো বছর আগে একদল মানুষ এই সব গভীর জঙ্গলে এসে বসবাস শুরু করে। কালক্রমে ভিন্নজাতির সঙ্গে মিলন হয়ে বিশেষ ধরনের এই এক সংকর জাতির উৎপত্তি। এদের সম্পর্কে আমার যেটুকু জানা বলছি, কিন্তু এদের সম্বন্ধে জানবার আপনার কৌতূহল যদি থাকে, লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ব বিভাগের কোন অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারবেন।

পরে, লখনউ-এ অধ্যাপক ডাঃ সিং-এর সঙ্গে আমার পরিচয়ের সুযোগও হয়। থারুদের সম্বন্ধে যা জানতে পারি সংক্ষেপে লিখি।

॥ ছয় ॥

হিমালয়েই শুধু তরাই অঞ্চলের থারুদের বাস। তাও মাত্র কয়েকটি অঞ্চলে। উত্তরপ্রদেশের তরাই জঙ্গলের বিচ্ছিন্ন কয়েক জায়গায় এবং বিহারের তরাই-এরও সামান্য দু একটা স্থানে। নেপালের দক্ষিণাংশের তরাই-এও এদের পূর্বপুরুষ ঠিক কতোকাল আগে, কোথা থেকে, কী কারণে, এই গভীর বনে এসে বসবাস শুরু করে, তা স্থির করবার মত কোন ঐতিহাসিক তথ্য এখনও পাওয়া যায়নি। থারু নামের উৎপত্তিই বা কী থেকে তাও সঠিক জানা নেই। নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে নানামুনির নানা মত। জল্পনা, কল্পনা। জনপ্রবাদেরও প্রচলন। 'কলকাতা' নামের উৎপত্তির যেমন একটা গল্প, সদ্য আসা সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে বলা, 'কাল কাটা' 'গতকাল কেটেছি' এখানেও তেমনি এক বিদেশী লেখকের মতে, বাইরে থেকে এই বনে এসে এখানেই তারা থেকে গেল—তাই 'ঠহরে' থেকে 'থারু'।

এই ধরনের ধ্বন্যাত্মক উৎপত্তির অনুমান আরও আছে। তবে, থারুদের পূর্বপুরুষরা যে স্থানীয় অধিবাসী ছিল না, বাইরে কোন

স্হান থেকে এখানে আসে সে বিষয়ে নৃতত্ত্ববিদরা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিচার করে স্থির করেছেন।

এদের মুখের আকৃতি, চোখের গড়ন খাস নেপালীদের মত—মোঙ্গলীয়ান। অথচ, দৈহিক গঠন, দেহবর্ণ, চালচলন আদিতে উত্তর ভারতীয়। কিন্তু কোন্ কোন্ জাতির সংমিশ্রণে এদের উৎপত্তি তা নির্ধারিত হয়নি।

থারুদের নিজেদের মধ্যে প্রচারিত জনপ্রবাদ, চার পাঁচ শো বছর আগে মোগল সম্রাটরা যখন স্বাধীনচেতা শিশোদিয়া বীর রাজপুতদের যুদ্ধবিগ্রহে বিধ্বস্ত করেন, তখন রাজপুত রমণীরা তাঁদের নিম্নজাতীয় অনুচরবর্গ নিয়ে স্বদেশ ছেড়ে হিমালয়ের বনে-জঙ্গলে পালিয়ে আসেন। প্রাণ ও ধর্ম রক্ষা করেন। কিন্তু কালক্রমে উচ্চবংশের সেই রাজপুত রমণীরাই তাঁদের সঙ্গে আসা নিম্নশ্রেণীর পরিচারকদের সঙ্গে ঘর করতে শুরু করে দেন। তারই ফলে এই অরণ্য অঞ্চলে থারুদের বিভিন্ন উপনিবেশের পত্তন ও এই সংকর জাতির উৎপত্তি। রাজস্থানের মরুভূমি—থার—অঞ্চল থেকে এসে তাদের এই বসবাস শুরু, নামও তাই থারু, এই মতেরও প্রচলন আছে।

থারুদের বংশোৎপত্তির এই প্রচলিত প্রবাদের বিচিত্র পরিণতি ফুটে ওঠে তাদের সংসারজীবনে। মেয়েরা তাদের রাজপুত কুলাভিমান ভুলতে পারে না, অথচ নিম্ন জাতের পুরুষদের নিয়ে সংসার পাতে, ফলে সামাজিক ব্যবস্থায় মেয়েদেরই প্রাধান্য দেখা দেয়।

অধ্যাপক সিং সেই সব গল্প করতে করতে বলেন, শুধু সামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, সাংসারিক জীবনও আচারে বিচারে মেয়েরা নিজেদের উঁচু জাত রক্ষায় এমনি সজাগ, যে পুরুষদের রান্নাঘরে প্রবেশ করতে দেয় না, তাদের ছোঁওয়া কোন খাদ্যও স্পর্শ করে না।

অধ্যাপকের কথাগুলি শুনে হেসে ফেলি। মনে পড়ে যায়, "শ্রীকান্ত"র সেই টগর বোষ্টমীর নন্দ মিস্ত্রীকে জাতের গর্ব করে গর্জে উঠে বলা, "জাত বোষ্টমের মেয়ে আমি, আমি হলুম কৈবত্তের পরিবার !....বিশ বছর ঘর করছি বটে, কিন্তু একদিনের তরে হেঁশেলে ঢুকতে দিয়েছি ? সে কথা কারও বলবার জো নেই।"

অধ্যাপককে কাহিনীটা শোনাই। তিনি বলেন, শ্রীকান্ত ? সে বই হিন্দিতে আমার পড়া, তবে ও ঘটনাটা মনে নেই।

তারপর বলেন প্রাচীন হিন্দুদের মত থারুদেরও জাতিভেদ আছে। তাদের সমাজেও ছয় গোত্রের থারুরা মনে করে তারাই সেই রাজপুত রমণীদের বংশধর, অতএব উচ্চ শ্রেণীর, অপর থারুরা নীচু জাতের। নেপালী থারুদের সঙ্গেও এ অঞ্চলের থারুদের যোগাযোগ আছে, বিবাহাদিও হয়।

আমি মন্তব্য করি, রাজস্হান বা আর যেখান থেকেই, যে কোন কারণেই হোক না কেন, হিমালয়ের এই তরাই-এর গভীর জঙ্গলে এসে

বাস করে বেঁচে থাকা থারুদের অসীম সাহস, দুর্জয় শক্তি, ধৈর্য ও অধ্যবসায় পরিচয় দেয়। চার পাঁচ শো বছর আগে এ জঙ্গল কী ভয়াবহই না ছিল! যেমন প্রচুর হিংস্র বন্য জন্তুর বাস, তেমনি ম্যালেরিয়া।

অধ্যাপক বলেন, স্থান নির্বাচনেরও কঠিন সমস্যা ছিল। ঘোর জঙ্গল, জলা জমি, তারই ভিতর খুঁজে খুঁজে যেখানে অনেকখানি উঁচু খোলা ডাঙা জমি পেয়েছে সেইখানে ডালপালা কাঠ কেটে কয়েকটা চালাঘর তোলে, প্রত্যেক বাড়ির জন্যে যথেষ্ট জমি ছাড়ে নিজের নিজের চাষবাসের জন্যে। এখানকার জমির উর্বরতা প্রচুর। যে যার আপন চাষ করে খাবে। এই কারণে, কয়েকটি মাত্র ঘর নিয়ে ছোট ছোট গ্রাম, তিন চার মাইল তফাতে। এইভাবেই শুরু হোল এদের কৃষিজীবন। ভেড়া ছাগল—পশুপালনও করে, মুর্গি পোষে। বনে শিকার তো আছেই। আর আছে নদী, নালা, ঝিলে মাছ ধরা—এটা মেয়েরাই বেশি করে।

হিন্দু দেবদেবী মানে, পুজো উৎসবাদিও করে, আবার পাহাড়িয়াদের মতন ভূতপ্রেতেরও ভয় আছে। খাদ্যাখাদ্যের বিচার নেই, সব রকম মাংসই চলে। আর মদ? মেয়ে ছেলে নির্বিশেষে সবাই হরদম পান করে, জলের মতন। উৎসবের সময় মেয়েদের সাজসজ্জা

ও নানারকম অলঙ্কার পরারও যথেষ্ট রেওয়াজ ; সেজেগুজে দল বেঁধে নাচগান তো আছেই।

অধ্যাপক তারই কয়েকটা ছবি এনে দেখান। তারপর বলেন, তবে, এদের মধ্যেও এখন আধুনিক সভ্যতার প্রভাব পেঁছে গেছে, আচার বিচারও বদলাচ্ছে, বিশেষ করে উপজাতি উন্নয়ন সমিতি প্রভৃতির প্রচেষ্টায়,—এতে তাদের কতোখানি ভালো বা মন্দ হচ্ছে সে সম্পর্কে মতভেদ আছে।

এই থারুদের নিয়ে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃতত্ত্ববিভাগে অনেকদিন থেকে গবেষণাও চলেছে।
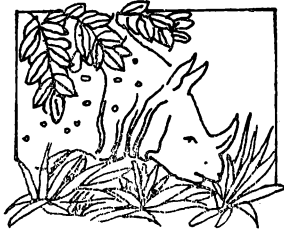
॥ সাত ॥

সেই থারুদের পল্লী ছাড়িয়ে বনের মধ্যে আরও কিছুক্ষণ ঘুরে বেলা নয়টায় ঘরে ফেরা হয়। অরণ্যের শোভা ও স্তব্ধ মাহিমা মনে পরম পরিতৃপ্তি আনে। কিন্তু, হরিণ ও শম্বর ছাড়া আর কোন বন্যপ্রাণীর সাক্ষাৎ মেলে না।

বনের বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি ছোটখাট বনবিশ্রাম ভবন আছে। তার দু একটির পাশ দিয়ে ঘুরে আসার সময় অমরনাথ জানান, বনের একেবারে ভেতরে এ সব বাংলো, এরই কোন একটিতে রাত কাটালে বাড়ি বসে অনেক জন্তুর ঘোরাফেরা দেখা যায়ই।

প্রাতরাশ সেরে অমরনাথ তাঁর সরকারি কাজ দেখতে বেরিয়ে যাবার সময় বলে যান, কাজ সেরে ফিরে এসে বিলি অর্জুন সিং-এর কাছে নিয়ে যাব। তারপর বিকেল পাঁচটায় হাতি চড়ে বনের ভেতর ঘোরা যাবে। তখন বাঘের দেখা পাবেনই।

বলি ঠিক আছে। দেখা দিলে দেখা যাবে।

কিন্তু, পরে অর্জুন সিং-এর কাছে আর যাওয়া হয় না। অনেক বেলায় অমরনাথ ফিরে আসেন। জানান, অর্জুন সিং বাড়িতে নেই, কোথায় গেছেন।

আমি হেসে বলি, দেখ, হাতি চড়ে ঘুরে বাঘেরও দেখা মেলে কিনা।

পাঁচটার আগেই খবর আসে, হাতি তৈরি। আমরাও তখনি নেমে যাই। বাগানে একটা কাঠের উঁচু প্ল্যাটফর্ম। ধাপ বেয়ে তার ওপরে উঠে তাতে গা লাগিয়ে দাঁড়ানো হাতির পিঠে হাওদায় বসি। বিরাট হাতি। হেলে দুলে চলতে শুরু করে। থপ থপ করে লম্বা পা ফেলে। মাঝে মাঝে হুঁ-স্ হুঁ-স্ অদ্ভুত শব্দ করে।

বড় রাস্তা দিয়ে সামান্য গিয়েই ডান দিকে বনের মধ্যে হাতি নেমে পড়ে। সেখানে কোন পথচিহ্ন নেই, বন জঙ্গল ভেদ করে যাওয়া। প্রথম দিকে ছাড়াছাড়া বড় বড় গাছের বন। স্বচ্ছন্দে সেটুকু পার

হয়ে এলে এবার যথার্থ গাঢ় বনের মধ্যে প্রবেশ।

কাল থেকে কেবলি মনে হয়েছে, দুধ্‌ওয়ার জঙ্গলের বৈচিত্র্যময় নানা পরিবেশ দেখলাম বটে, কিন্তু এখানে তেমন নিবিড় অরণ্য কই? এইবার সেই অরণ্যেরই দেখা পাই। নিশ্ছিদ্র বনানী। চারিদিকে ঘিরে গাছপালা। ঘনপল্লব, লতাজটিল, আদিম মহারণ্য। গাছগুলির আকৃতিও তেমনি, কদাকার, আঁকা-বাঁকা. কেমন যেন ক্রূর. হিংস্র ভীষণ মূর্তি। যেন, বর্শা বল্লম আদি অস্ত্রধারী নগ্নদেহী বর্বর প্রহরীদল। তবুও, তাদের সেই নিবিড় পাহারা সত্ত্বেও গোপনে অরণ্যের অন্তঃপুরে শতচ্ছিন্ন দীনবেশে ম্লানমুখী আলোর প্রবেশ।

ভাবি, ঐ দুর্ভেদ্য অরণ্য ভেদ করে এই বিশাল বপু হস্তী যাবে কী করে! কিন্তু যায়। মাহুতের চালনার নির্দেশে। এধারে ওধারে ঘুরে ঘুরে। বাঁকাচোরা উঁচু নীচু পথে। দুপাশে আঁকাবাঁকা গাছের ডালপালা পথরোধ করে। শুঁড় দিয়ে সেসব হিড়হিড় করে টানে, ভাঙে, বা সরিয়ে দেয়। নিচের আগাছার জঙ্গল পা দিয়ে দুরমুশের মত দলে চেপে চলতে থাকে। কখন-বা কচি পাতা সমেত ডাল পেলে মুখে পোরে।

আমাদেরও সদা সতর্কে থাকা, পাছে দুপাশের গাছের ডালপালা গায়ে এসে আঘাত করে। কাছাকাছি এলেই গায়ে লাগার আগেই সেসব

ডাল হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিই, অথবা মাথা হেঁট করে এড়িয়ে যাই।

অমরনাথ সাবধান করেন, দেখবেন ডালে সাপ জড়িয়ে থাকতে পারে!

বনের মাঝে হঠাৎ এসে যায়, একটুকরো খোলা মাঠ। রুদ্ধশ্বাস গহন বন যেন ফাঁকায় এসে দম নেয়। মাঠভরা প্রকাণ্ড উঁচু ঘাস। এত লম্বা, হাতিও যেন সেই ঘাসে ডুবে যায়। পিঠের ওপর বসেও আমাদের পায়ে ঘাসের শিসের খোঁচা লাগে।

মাহুত গভীর বনের মধ্যেও যেমন পথ চেনে, তেমনি জানে, ঠিক কোন অঞ্চলে কখন কোন জানোয়ার দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা। সারাক্ষণই সতর্ক দৃষ্টি ফেলে এদিকে ওদিকে। কখন থমকে হাতিকে দাঁড় করায়। আমরাও উৎসুক নয়নে তাকাতে থাকি। ঘাসের জঙ্গলে এসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে। বাঘেদের নাকি এটা মনোমত স্থান। প্রায়ই তৃণশয্যায় শুয়ে বা বসে বিশ্রাম নেয়। কিন্তু আজ কোথায় বাঘ? দেখা নেই।

আর একটু এগিয়ে চলে। বনের মধ্যে ঝিরঝিরে ঝরনাধারা, নিশ্চয় সেই জলের ধারে বাঘ বসে। নাঃ, সেখানেও নেই। বনের ওদিকে গাছের নীচে জঙ্গলের মধ্যে কী যেন নড়ে। হাতি তখনি চলে সেই-

দিকে। হুড়মুড় করে কী যেন পালায়। ঐ যে দেখা গেল। না, বাঘ নয়। প্রকাণ্ড শম্বর! আজ তাহলে এদিকে এখন বাঘ নেই! নিয়ে চলে বনের আর এক অঞ্চলে। সেখানেও নিবিড় বন। সেখানেও কয়েকটা বনমোরগ ছাড়া আর কোন প্রাণী দেখা গেল না। ঘুরতে ঘুরতে চলে আসে বন ছেড়ে সুহেলী নদীর ধারে। নদীর তীর ধরে কিছুদূর যাওয়া।

অমরনাথ বলে, এ নদীতে কয়েকটা মেছো কুমীর আছে। নেমে দেখবেন নাকি?

কুমীর দেখার উৎসাহ থাকে না। সাতটা বাজে। অন্ধকার নামার আগে ঘরে ফিরতে হবে। তাই ফেরাও হয়।

বাংলোয় ফিরে দু তিনটে দল ট্যুরিস্টদের সঙ্গে দেখা। তাঁরাও আজ জীপে ও হাতি চড়ে বনে ঘুরেছেন। প্রতিদলই কোথাও না কোথাও বাঘের দেখা পেয়েছেন। আমরাও যে-সব জায়গা দিয়ে

ঘুরেছি—সেইখানেই।

অমরনাথ শুনে দুঃখ প্রকাশ করেন। বলেন, আশ্চর্য! আপনাকেই শুধু বাঘ দেখানো গেল না, এখানে এমন কখনো হয় না।

আমি জানাই, তার জন্যে আমি কিন্তু দুঃখিত নই; পাহাড়ে বনে বাঘ আমার দেখা। আমার যথেষ্ট আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ হয়েছে দুধ্‌ওয়া অরণ্যের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক রূপ দেখে। দুধ্‌ওয়া আরণ্যক প্রকৃতির প্রকৃতই লীলাভূমি।

—তারপর হেসে মন্তব্য করি, বাঘ দেখাতে না পারায় তুমি মন খারাপ করছো কেন? আর একটা দিক দেখছ না? যে বনে সত্তরটা বাঘ, সবাই এসে বাঘ দেখতে পায়, সেখানে আমাকে নিয়ে এতো ঘোরালে, একটা বাঘেরও সাহস হোল না আমার সামনে আসে।

অমরনাথ হেসে ওঠেন। বলে, তা বটে! যাক, এখন কাল সকালে গণ্ডার দেখতে যাওয়া। দেখা যাক, সেখানে কী হয়!

পরদিন। সকাল সাড়ে ছয়টায় মোটর করে যাত্রা। আশ্চর্য হই। মোটর করে গণ্ডার দেখতে যাওয়া।

অমরনাথ জানান, বনের আর এক প্রান্তে যেতে হবে; সে পর্যন্ত যাবার ভাল রাস্তা, মোটরে যাওয়াই সুবিধে। তারপর গণ্ডার দেখতে সেখানে আবার হাতি চড়ে ঘুরতে হবে। হাতি সেখানে নিয়ে গেছে ভোরে। এতোখানি পথ হাতিতে যেতে আপনার কষ্ট হবে ভেবে, এই

ব্যবস্থা করেছি।

আমি বলি, বনে ঘুরতে আসা, কষ্ট একটু হলে ক্ষতি কী? এ সব কষ্ট স্বীকার করার মধ্যেও আনন্দ থাকে।

অমরনাথ বলে, সে আনন্দ সেইখানে হাতি চড়ে পাবেন না হয়।

মোটরে যেতে যেতে অমরনাথ জানান, গণ্ডারদের বনের একটা স্বতন্ত্র অঞ্চলে রাখা হয়েছে, পাঁচ হাজার ভোলট-এর বৈদ্যুতিক তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে—

আমি আশ্চর্য হয়ে বলি, তা হলে চিড়িয়াখানায় রাখার মতন! এই বনে এসেও তাদের এমন বন্দী-দশায় দেখার রোমাঞ্চ বা আনন্দ কোথায়?

অমরনাথ হাসে। বলেন, যা ভাবছেন ঠিক তা নয়। এখানে ছোট্ট এলাকায় তাদের বন্দী করে রাখা নয়। সেই অঞ্চলের পরিধি কতোখানি, শুনবেন? ২৫ বর্গ কিলোমিটার। ঐ সাতটা গণ্ডারের পক্ষে যথেষ্ট। আর ঐ সমস্ত এলাকা বৈদ্যুতিক তারে ঘেরবার প্রয়োজন হোল, প্রথমত, গণ্ডারগুলি যাতে বনের অন্যত্র চলে গিয়ে নিজেদের বিপদ টেনে না আনে, অথবা বনের বাইরে বেরিয়ে চাষীদের আখ-খেতে ঢুকে ক্ষতি না করে। দ্বিতীয়ত, মাদী গণ্ডার দুটি গাভীন হয়েছে, তাদের বাচ্চা হলে বাঘ বা লেপার্ড এসে না খেয়ে

ফেলে। তাদের বাঁচানো চাই। নির্বিঘ্নে প্রসব হয়ে বাচ্চাগুলি বেঁচে থাকলে বনদপ্তরের এই গণ্ডার পুনর্বাসন প্রকল্পের সাফল্য।

পৌঁছে যাই বনের সেই প্রান্তে। হাতি আগে পৌঁছে অপেক্ষা করছে। বনরক্ষী বেড়ার গেট খুলে দেয়। হাতি হাঁটু গেড়ে বসে। গায়ে তার একটা ছোট মই লাগিয়ে দেয়। তাই বেয়ে পিঠের ওপর হাওদায় উঠে বসি।

অমরনাথ তখনকার বনরক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেন, খবর নিয়েছ, কোন দিকে গণ্ডার আজ চরছে?

সে মাহুতকে সেই অঞ্চল জানিয়ে দেয়। হাতি পথ ধরে সেইদিকে চলে। রাস্তার দুই পাশে ঘাসে ছাওয়া বিস্তীর্ণ প্রান্তর। মাঝে মাঝে কোথাও-বা দুএকটা গাছ, আর দূরে গভীর অরণ্যের "বনরাজিনীলা" ;—মনেই হয় না, এটাও ঐ আদিম অরণ্যেরই আর এক অঞ্চল।

মাহুত দুদিকের মাঠের পানে দৃষ্টি ফেলতে ফেলতে এগিয়ে চলে, কোথায় গণ্ডার ঘোরে, তারই সন্ধানে। প্রায় মাইলখানেক যাবার পর পথ ছেড়ে হঠাৎ বাঁদিকের ঘাসভরা মাঠের ভিতর হাতিকে নামায়।

ভাবি, নিশ্চয় দেখতে পেয়েছে! কোন দিকে? উৎসুক হয়ে এদিক ওদিক তাকাই। ঐ তো! বড় বড় উঁচু ঘাসের মধ্যে কী যেন নড়াচড়া করে? গণ্ডারই তো চরে বেড়ায়—একটা।

মাহুত হাত ইশারায় দেখায়, ওই দিকে ঐখানে আরও একটা। হাতিকে নিকটে নিয়ে চলে।

গণ্ডারটা ঘাস খাওয়া ছেড়ে মুখ ফিরিয়ে তাকায়। কী কুৎসিত দেখতে! যেমন মুখের গড়ন, তেমনি গায়ের ভীষণ পুরু কুঁচকানো ঝলঝলে চামড়া, নাকের ওপর সেই খড়্গ! হাতিটাকে একবার দেখে। তারপর, হয়ত বিরক্ত হয়েই পিছন ফিরে ঘুরে হন্তদন্ত হয়ে চলে যায়—একটু দূরে। সেখানে আবার ঘাস খেতে শুরু করে।

মাহুত হাতি চালিয়ে নিয়ে চলে—মাঠের আর এক দিকে, আরও ভেতরে। সেখানে আশে পাশে জল কাদা,—তারই ভেতর এক গণ্ডার বসে। হাতি দেখে কাদা মাখা দেহে উঠে দাঁড়ায়। হাতিটার দিকে তাকাতে থাকে। পাশ দিয়ে আমরা অন্য দিকে চলে যাই।

অমরনাথকে বলি, একে দেখে মনে পড়ল জলদাপাড়ার জঙ্গলের এক ঘটনা। সেখানেও এমনি হাতি চড়ে বনের মধ্যে ঘুরছি গণ্ডার দেখতে। দেখতেও পাই। এমনি মাঠের মাঝে কয়েক জায়গায় তিন

চারটে এখানে ওখানে চরে বেড়াচ্ছে। ফেরবার পথে আর এক জায়গায় নরম মাটির ওপর পায়ের ছাপ দেখে মাহুত সেদিকে অনুসরণ করে চলে। অল্প যেতেই লম্বা লম্বা ঘাসের ঝোপ, নিরিবিলি একান্তে বেশ ছায়ায় ঢাকা একটা ডোবা, জলকাদায় ভর্তি। সেটার পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে হঠাৎ নজর পড়ে, ওকী। সেই কাদার মধ্যে বসে একটা গণ্ডার! পাশেই তার একটা বাচ্চা!

আচমকা ঐভাবে অতো কাছে হাতিটা এসে পড়ায়, গণ্ডারও চমকে ওঠে, হুড়মুড় করে কাদা মাখা শরীরে উঠে দাঁড়ায়, বাচ্চাটাকে পেছনে রেখে। হাতিটাও থমকে হাত পাঁচ ছয় দূরে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। তারপরই গণ্ডারটা বেগে মাথা নীচু করে যেন তেড়ে আসে হাতির দিকে, মাহুতও সঙ্গে সঙ্গে বন্দুকটা তার দিকে তাগ করে, আমরা ভাবি, বুঝি গুলিই করে!

চক্ষের পলকে ঘটা ব্যাপার। গণ্ডার কিন্তু ওদিকে দুপা এগিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে গেছে, ফোঁসফোঁস শব্দ করছে, গুঁতোবার মত মাথা নাড়াচ্ছে। মাহুতও বন্দুক ধরে থেমে আছে। হেসে আমাদের বলে, ভয় পাবেন না, গুলি করব না। আমরা বলি, বাপু, ফিরে চল, আর না, খুব গণ্ডার দেখা হয়েছে!

অমরনাথ গল্প শুনে বলেন, বাচ্চা সমেত বন্য জীবজন্তু থাকলে

তাকে কখনই বিরক্ত করতে নেই, ক্ষেপে যেতে পারে। চলুন, ঐ ওধারে আরও একটা গণ্ডার চরছে।

তার পাশ দিয়ে এসে হাতিটা আবার মাঠ ছেড়ে রাস্তায় ওঠে।

অমরনাথও এতোগুলি গণ্ডার দেখাতে পারায় মহা খুশি।

ফিরে চলি বিশ্রাম ভবনে। বনভ্রমণও শেষ হয়। যাত্রা করি লখনউ অভিমুখে। প্রকৃতির আদিম অরণ্য ছেড়ে আবার সভ্যজগতের লোকারণ্যে।

খাজুরাহোর পথে

গোড়াতেই বলে রাখি, খাজুরাহোর সুবিখ্যাত মন্দিরগোষ্ঠীর অপরূপ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পের বর্ণনা দেওয়ার উদ্দেশ্য আমার নয়। বছর পঁচিশ আগে খাজুরাহো দেখতে যাই, সেই যাত্রাপথের এটি এক ছোট্ট ভ্রমণকাহিনী।

খাজুরাহোর কথা প্রথম শুনি, আমার ১৯৬২ সালের যাত্রার প্রায় বছর চল্লিশ আগে। সে সময়ে আমি কলেজের ছাত্র। প্রাচীন ভারতের শিল্পকীর্তির বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি দেশের কোন্ কোন্ অঞ্চলে ছড়িয়ে আছে, কেমনই বা সেই সব শিল্পকলার উৎকর্ষ, কী-ই তাদের বৈশিষ্ট্য জানবার, বোঝবার তখন আমার অসীম আগ্রহ ও কৌতূহল। এ সব নিয়ে তখন নানান গবেষণা চলছে পণ্ডিত মহলে।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের লুপ্তধারা বিস্মৃতির আঁধার থেকে ধীরে ধীরে জ্ঞানের আলোকে উদ্ভাসিত হচ্ছে। প্রাচীন মন্দির, শিল্প-শোভিত গিরিগুহা কালের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে থেকে প্রকাশ পাচ্ছে। খাজুরাহোও তারই মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়াল। ভারতীয় মন্দির-স্থাপত্যের এক স্বর্ণযুগের কীর্তিকলাপ আবিষ্কৃত হোল।

কিন্তু, তবুও তখনকার ব্রিটিশ আমলে খাজুরাহোর নাম জনসাধারণের মধ্যে তেমন প্রচারলাভ করে নি। সেখানে যাতায়াতের পথের সুবিধাও তখন তেমন ছিল না।

এর সম্ভবতঃ একটা কারণ, খাজুরাহোর অপরূপ শিল্প-সৃষ্টি সম্পর্কে কিছু অখ্যাতিও জড়িত থাকে। সেখানকার অনেকগুলি মিথুনমূর্তির কামলীলার সবিন্যাস প্রকাশ হয়ত বৃটিশমনের শুচি-বোধকে আঘাত করে। এ মন্দিরগোষ্ঠীর সৌন্দর্য সম্বন্ধে বহুল প্রচার তাই সম্ভবতঃ বিদেশী সরকার করেন নি।

ভারতের স্বাধীনতার পর খাজুরাহোর খ্যাতি এখন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। যাতায়াতের সুবিধাও অনেকটা হয়েছে। দেশ-বিদেশ থেকে ট্যুরিস্টও চলেছে দেখতে। দলে দলে। তাঁদের প্রোগ্রামে তাজমহলের সঙ্গে এখন খাজুরাহোও স্থান পেয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকেও বহু পর্যটকও যাচ্ছে দেখতে। নানান শ্রেণীর দর্শক। ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টি নিয়ে তারা দেখে। অনেকের হাতে সময়ের টানাটানি। তাই, দিল্লী থেকে সাপ্তাহিক প্লেনও চালু হয়। গিয়ে নামে পান্না শহর থেকে সাত মাইল দূরে। সেখান থেকে মোটরে ৩৬ মাইল খাজুরাহো।

আমরা সাধারণ যাত্রী। চলেছি ট্রেনে।

দিল্লী থেকে ট্রেনে যাবার পথ,—ঝাঁসিতে ট্রেন বদল করে হরপালপুর। তারপর সেখান থেকে বাস-এ ৬১ মাইল,—নওগাঁ ও ছত্তরপুর হয়ে।

আমরা যাচ্ছি এলাহাবাদ থেকে ট্রেনে ভিন্ন আর এক পথে।

১৯৬২ সাল। ফেব্রুয়ারী মাস।

সকাল দশটায় হাওড়া-বম্বে মেল ধরতে এলাহাবাদ স্টেশনে হাজির হয়েছি। সঙ্গী,—বন্ধু ইন্দুমাধব ও সেকালের সাহিত্যিক মহলে সুপরিচিত 'মীরাটের অবনীবাবু'।

তিনখানা নিম্নশ্রেণীর টিকিট কাটা হয়েছে। কিন্তু, সেই শ্রেণীর কোন কামরাতেই ঢুকে দাঁড়াবার মতও জায়গা নেই। বার দুই ইঞ্জিন থেকে গার্ডের গাড়ি পর্যন্ত হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি করেও নিরাশ হতে হয়। অথচ, দেখা যায়, থ্রি-টায়ার সংরক্ষিত আসন কামরায় অনেক বার্থ-ই খালি। নিরুপায় হয়ে তাইতেই উঠে বসি।

কন্‌ডাকটার দেখতে পান। এসে টিকিট দেখতে চান। দেখে বলেন, এ টিকিটে এ কামরায় যাওয়া চলবে না, নেমে যান।

ইন্দু বলে, জানি। কিন্তু, সাধারণ কামরায় অসম্ভব ভিড়। কোথাও ভেতরে ঢোকা সম্ভব হচ্ছে না। মাত্র দুটো স্টেশন পরে বেলা তিনটেতে সাটনায় নেমে যাব, মশাই,—আপত্তি করবেন না।

তিনি মানতে চান না। আইন দেখিয়ে, কঠোর হয়ে, নামিয়ে দেন।

আবার একবার ট্রেনের এ-প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত নিষ্ফল দৌড়ানো। ট্রেন ছাড়ার সময়ও এসে পড়ে। অগত্যা আবার থ্রি-টায়ার সংরক্ষিত কামরাতেই প্রবেশ করে বসে পড়ি। সঙ্গে সঙ্গে ট্রেনও চলতে

শুরু করে।

অল্প পরেই কনডাকটারও যমদূতের মত সামনে এসে দাঁড়ান। রূঢ়কণ্ঠে রাষ্ট্রভাষায় বলেন, আপনাদের বার করে দেওয়া হোল, তবু আবার এসে ঢুকেছেন এ কামরায়! কী রকম আদমী আপনারা!

ইন্দু মোলায়েম করে বোঝাতে চেষ্টা করে, আমরা মশাই আইন-কানুন মেনেই চলি। কিন্তু, আজ এইটুকু অমান্য করতেই হোল। কী আর করব বলুন? টিকিট কেটেছি। যাব মাত্র দুটা স্টেশন দূরে। কোথাও ওঠা সম্ভব হোল না।

কনডাকটারের সহানুভূতি জাগে না। আইন দেখান। বলেন, দুটা স্টেশন মাত্র দূর হলেও এ কামরায় যাওয়া চলবে না, নেমে যেতে হবে।

আমি হেসে বলি, এখনি? চলন্ত ট্রেন থেকেই? দেখুন, এখানে তো সব খালি বার্থ পড়ে রয়েছে, বেশ তো, তিনটে বার্থ আমাদের রিজার্ভ করে দিন,—টাকা দিচ্ছি।

কনডাকটার বলে, তা হলে এক একজনের দশ টাকা করে লাগবে! ত্রিশ রুপিয়া!

ইন্দু হেসে বলে, তাই দিচ্ছি মশাই। রসিদ কাটুন।

এতক্ষণে কনডাকটারের সহানুভূতির উদয় হয়। বলেন, ত্রিশ রুপিয়া এইভাবে খরচ করবেন! এই তো একটা স্টেশন এসে যাচ্ছে, মাঝে আর একটা স্টেশন। এর জন্যে অতোগুলো টাকা খরচ করবেন?

ইন্দু গম্ভীর ভাব দেখিয়ে বলে, কিন্তু, আর উপায়ই বা কী? না হলে, আপনি তো আমাদের নামিয়ে দিতে চান।

—ত্রিশ টাকা তখনি বার করে তাঁকে দেওয়া হয়। টাকাগুলো হাতে পড়তেই যাত্রীদের হিতাকাঙ্ক্ষী কনডাকটারের দরদী হৃদয় আমাদের সাহায্য করার আবেগে আপ্লুত হয়। রসিদ খুলে কোমল কণ্ঠে বলেন, দেখিয়ে বাবুজি! এতনা রুপিয়া খরচ হো জায়গা! সোচ্ লিজিয়ে! আউর এক-দো ঘন্টা বাদ আপ্‌লোগ পৌঁছ যায়েঙ্গে।

আমরা পরস্পরে মুচকি হাসি। ইন্দু তার হিতবাণীর নিহি-

তার্থের ইঙ্গিত না বোঝার ভান করে বলে, কন্ডাকটারজি ! আপনার সহানুভূতির জন্যে অশেষ ধন্যবাদ। কিন্তু কানুন মাফিকই আপনি ডিউটি করছেন। এ কামরার মাসুল না দিলে তো আমরা এতে যেতে পারি না, আপনিও যেতে দেবেন না। টাকা বাঁচাবার অন্য উপায় তো আমাদের জানা নেই। এখন টাকা নিয়ে রসিদ কাটুন।

কন্ডাকটার তারপরও নোট তিনটে হাতে নিয়ে 'দেখিয়ে এত্না রুপিয়া,—সোচ্ লিজিয়ে' বলতে বলতে রসিদটা অবশেষে কাটেন—

ট্রেন মাণিকপুর স্টেশনে দাঁড়ায়। আমরা এখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসি। মেল ট্রেন আবার ছুটে চলে। বেলা তিনটেতে পেঁছয় সাটনায়,—আমাদের গন্তব্য স্টেশনে।

শুনেছি, এইখান থেকে সোজা বাস যায় খাজুরাহোতে। খবরটা ঠিকই। কিন্তু সম্পূর্ণ নয়। সোজা বাস্ যায় দিনে একটি মাত্র। সকাল ছটায় ছাড়ে। পথে মাইল ৪৫ দূরে পান্না শহর,—সাটনা থেকে সেই পান্নার বাস্ কিন্তু ঘন ঘন ছাড়ে। তাই সেদিন পান্না পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে রাত্রিবাস করা হয় তো চলত। কিন্তু, যখন খবর শুনি, কাল সকালে এই সাটনার সকালের বাস্টাই পান্নায় আমাদের ধরতে হবে, তখন স্থির করা হয়, এখান থেকেই কাল সকালে সেই বাস্-এ আগে থেকে জায়গা নিয়ে বসে একটানা যাওয়া ভাল। কিন্তু এখানে রাত কাটানো যায় কোথায় ? তারও এক সুরাহা হয়ে গেল।

ইন্দুর এক বন্ধুর ভাই এখানে রেল দপ্তরে কাজ করেন। তাঁর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। প্রবাসী বাঙালী। আমাদের পেয়ে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন। সাগ্রহে নিয়ে চলেন তাঁর কোয়ার্টার্স-এ। বলেন, থাকবেন এখানেই। আবার কোথায় ? এক রাত্তিরের তো ব্যাপার।

আদর-যত্নের ত্রুটি থাকে না। তাঁর ছোট ছেলেটিও বাড়িতে নতুন লোক পেয়ে মহা খুশি। ইন্দু গল্প করে তাকেও মাতিয়ে রাখে। ইন্দুও এখন প্রবাসী—এলাহাবাদবাসী। তাই প্রবাসী বাঙালীর ছেলেমেয়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার সমস্যার কথা তোলে তার বাবার কাছে। জিজ্ঞাসা করে, একে বাঙলা পড়তে লিখতে শেখাচ্ছ তো ?

ভদ্রলোক বলেন, সেটা তো বাড়িতে শেখানো হচ্ছে। ওর মা নিজেই শেখায়। স্কুলে তো বাঙলা পড়ার ব্যবস্থা নেই। কিন্তু, মহামুস্কিল হয়েছে স্কুলের পড়শুনা নিয়েই। এখানে আছে একমাত্র মিউনিসিপ্যালিটির স্কুল, সেইখানেই পড়ে। এখন স্বাধীন দেশে ছেলেমেয়েদের ফ্রি-এডুকেশন হয়েছে। ভাল কথাই। কিন্তু, বিপদ হয়েছে, স্কুলের সহপাঠীরা সমাজের নানান্ স্তর থেকে আসে। অতি নিম্নশ্রেণীর ছেলেরাও এর সঙ্গে পড়ে। প্রথা হিসাবে এ ব্যবস্থাও ভাল। কিন্তু তাদের কথাবার্তা, ভাষা, সামাজিক রীতিনীতি বুঝতেই পারছেন কী রকম ও কী স্তরের। আমার ছেলেও সেই সব ভাষা, হাবভাব তাদের দেখেশুনে শিখছে। সেদিন ওর মুখে হঠাৎ কটা সেই রকম অতি নোংরা ভাষা শুনে চম্‌কে উঠি, এ কী কাণ্ড! আমার ছেলের মুখে এ কী ভাষা! ছোট ছেলে-পিলে একসঙ্গে পড়ে, মেলেমেশে—পরস্পরের দেখে শিখবে, আশ্চর্য নয়, কিন্তু,—

ইন্দুদের আলোচনা এই ভাবে চলতে থাকে, সময় কেটে যায়।

পরদিন।

স্টেশনের নিকটেই কোয়ার্টার্স। বাস্‌স্ট্যাণ্ডও কাছেই। সকালের বাস্‌-এ ভিড়ও নেই। মাইল ৭৫ যেতে হবে। দীর্ঘ বাস্‌যাত্রা। বাস্‌-এর অবস্থা দেখে দুশ্চিন্তার কারণ থাকে না। ভাঙাচোরা ঝর্‌ঝরে বাস্‌-এ কাঠের বেঞ্চে বসে হিমালয়ের আঁকাবাঁকা চড়াই-উৎরাই পথে টাল সামলে যাওয়ার অভ্যাস ও অভিজ্ঞতা আছে,—এ বাস্ তো পুষ্পক রথ! নতুন। ঝক্‌ঝকে। ইঞ্জিন চলে, যেন বাজনা বাজে। সীট্‌-এ মোটা পুরু গদি। রাস্তাও বাঁধানো, চওড়া, সোজা। বাস্ জোরে চললেও মনে হয় যেন গড়িয়ে চলে। নিশ্চিন্ত আরামে তিনজনে বসে। শীতকালের সকাল। চোখে ঘুমের আবেশ আসে।

মাঝে মাঝে গ্রাম। বাস্ থামে। স্থানীয় যাত্রীরা ওঠে, নামে। সোজা খাজুরাহোর যাত্রী আমরা তিনজন ছাড়া আর একটি বাঙালী দল। তারাও তিনজন। আমাদের সাটনায় 'হোস্ট'-এর কাছে তাদের

পরিচয় পেয়েছি। ঐ অঞ্চলের এক বাঙালী অফিসারের মেয়ের সম্প্রতি বিবাহ হয়েছে। সেই নব-দম্পতি চলেছে খাজুরাহোতে—মধুচন্দ্রিমায়। সঙ্গে তাদের এক সঙ্গীও আছে।

বাস্-এর মধ্যে মেয়েটি যে-ভাবে নিবিড় হয়ে বসে স্বামীর কাঁধের ওপর মাথা রেখে চলেছে,—হয়ত বাঙালী বলে নিজেরাই আমরা একটু অস্বস্তি বোধ করি। কিন্তু আরও অশ্চর্য হই যখন বাঙালী জামাতা-বাবাজির উচ্চারিত ভাষা কানে আসে। সন্দেহ হয়, সত্যিই বাঙালী কী? ও কী ভাষা? স্-স্ করে কথা বলে হয়ত জিব্-এর দোষে, —'স্ এবার সু-স্-উ-রি গেলাম—সে্-এ কী স-ঈ-ত! জোল্-ও বাতাস্-এস্-শরীর জোল্সে জম্-এ গেল'!

ইন্দুর সঙ্গে আলাপ করে বলে, মস্আই, আপনারা কী রেস্-ট্ হাউস্-এ রিসসার্ভ করেছেন? তাহলে স্-সুবিধেই হবে। আমরা তো স্-সারাদিন থাকব না—ক' ঘণ্টা! তার মধ্যে ওখানে টাট্টি-উট্টি করে আসবো,—কী বোলেন?

ইন্দু কৌতূহল দমন করতে পারে না। জিজ্ঞাসা করে, আপনি জন্মাবধি এখানেই আছেন?

জামাই আশ্চর্য হয়ে বলে, স্-সাটনায় বলছেন? সে্-এ-কী কথা! এখানে তো স্-সাদি করলাম। হাঁ, মধ্যপ্রদেশেই জনম্—পোড়া-শুনাও। Accountant আছি।

বাস্ থেমেছে একটা গ্রামের মধ্যে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে কি দেখে জামাতাবাবাজি উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। বৌকে বলে, মিল্ গেছে!—বলে তাড়াতাড়ি নেমে পড়ে। একটু পরে ফিরে আসে। ডান হাতের বুড়ো আঙুল দিয়ে অপর হাতের তেলো কচ্লাতে কচ্লাতে। একমুখ হাসি। আমাদের দিকে তাকিয়ে বলে, 'আরে মো-স্-আই, রস্-ওদ ফুরিয়েছিল—অনেকক্ষণ খইনি না পেয়ে দিল্ বিগ্ড়ে যাচ্ছিল'—বলে মুখে খইনি ফেলে।

অবাক হয়ে আমরা তাকিয়ে দেখি, তার ব্রজবুলি শুনি। হাসব, কি কাঁদব বুঝি না। ভাবি, স্বাধীন ভারতের এ কোন্ মুল্লুকের লোক!

পান্নায় ঘণ্টাখানেক বাস্ দাঁড়াল। যাত্রীদের চা ও জলযোগ সাঙ্গ হোল। এইখানেই ভারতের প্রসিদ্ধ হীরের খনি। এ-যাত্রায় দেখার কৌতূহল নেই শিল্পলোকের হীরক জ্যোতি—খাজুরাহো এখন মন টেনেছে।

বাস্, আবার ছুটে চলে।

পান্না আসার আগে থেকেই পথের দু দিকে পাহাড় ও জঙ্গল শুরু হয়। পান্না ছেড়ে আসার পর পাহাড়ের শ্রেণী পথের চারিপাশে ঘিরে আসে। জঙ্গলও গভীর হয়। বাস্ও ক্রমশঃ ধীরে ধীরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠতে থাকে। যেন, ছোটখাটো হিমালয়ের মধ্যে দিয়ে চলা। পথের পাশে মাঝে লেখা বিজ্ঞপ্তি—'ghat begins', 'ghat ends'।

এরই এক জায়গায়, দুদিন বাদে, খাজুরাহো থেকে ফেরবার পথে, বাস্ ড্রাইভার আমাদের এক মনোরম স্থান দেখিয়ে আনে। বড় রাস্তা মাইল দেড় দুই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়া। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক রমণীয় উপত্যকা। হেঁটে অনেকখানি নিচে নামতে হয়। বড় বড় গাছের গহন বন। তারই মাঝে পাহাড়ের উপর থেকে এক জল-ধারা নীচে পড়ছে। এখন শীতকাল। তাই ক্ষীণকায়া। জলপ্রপাতের পাদদেশে সরোবরের আকারে পুঞ্জিত জলরাশি। তারই অপর প্রান্ত থেকে এক নদীর ধারা যেন মুক্তিলাভ করে ছুটে চলে। সরোবরের ধারে, অল্প উপরে, পাহাড়ের গায়ে কতকগুলি গুহা। ভিতরে কয়েকটি পাথরের দেবমূর্তি। এক সাধুজিও থাকেন। একা। বলেন, কয়েক বছর এখানে একান্তে নির্জনবাস করছেন। হিংস্র বন্য পশু? সেসব তো প্রায়ই দেখা যায়, সরোবরে জল খেতে আসে, অতি নিকট দিয়ে যাতায়াত করে, কিন্তু কখনও তাঁকে আক্রমণ করে নি, কোনরকম ক্ষতিও করে নি। তাঁর শান্তি ভাঙে বেশি যাত্রী এলে। আহারের ব্যবস্থা? হেসে বলেন, যিনি জোটাবার তিনিই জুটিয়ে দেন।

শুনে ভাবি, হয়ত গ্রামবাসীরা মাঝে মাঝে এসে দিয়ে যায়।

স্থানটির নাম শুনি, পাণ্ডব প্রপাত, Pandav falls।

সাটনা-বম্বে রেলপথের পূর্বদিকে মধ্য ভারতের বাহিরখণ্ড

ডিভিসন, পশ্চিমদিকে বুন্দেলখণ্ড। তারই এক অঞ্চল দিয়ে আমরা চলেছি। এইসব প্রদেশে বিন্ধ্যপর্বতশ্রেণী যেন তার জটাজাল ছড়িয়ে গভীর ঘুমে মগ্ন। চারিদিকের পাহাড় ঘিরে ছোটবড় ঘন গাছের জঙ্গল। যেন সর্বাঙ্গ লোমে-ভরা আদিম যুগের দানব উলঙ্গ দেহে শুয়ে। পাহাড়ের ফাঁকে ফাঁকে গভীর খাদ, সেখানে কালো কালো পাথর। তারই মাঝ দিয়ে বয়ে চলে পাহাড়ী নদী। পাহাড়ের ছায়া, বনের নিবিড়তা সূর্যের আলোককে সেখানে প্রবেশ করতে দেয় না। সে-সব স্থান যেন এ-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন। অথচ, সেই আদিম অরণ্যানীর মধ্যে এখনও বাস করে ভারতের আদিবাসীরা। আধুনিক সভ্যতার আলো বাতাসের বাইরে। বাস্-এ বসে এক স্থানীয় যাত্রীর মুখে শুনি তাদের অসীম সাহস ও দুর্ধর্ষতার কাহিনী। এরাই নাকি মধ্যভারতের কুখ্যাত ডাকাতের দল। ইংরেজ রাজত্বকালেও এরা বশ মানে নি। এখনও আতঙ্ক ও গভীর দুশ্চিন্তার ভার হয়ে আছে স্বাধীন ভারত সরকারের।

এ-সব অঞ্চলে শুধু এরাই নয়, বন্যজন্তুও প্রচুর। এখনও বাঘের দেখা প্রায়ই মেলে। এই কিছুদিন আগেই একটা বাস্ আসছিল পান্না থেকে। মাঝে গাড়ী খারাপ হয়ে যাওয়ায় পথে রাত হয়ে যায়। জঙ্গলের মধ্যে পাহাড়ের এক বাঁক ঘুরতেই ড্রাইভার দেখে, সামনেই পথ জুড়ে শুয়ে প্রকাণ্ড এক বাঘ! হেড্লাইট নিভিয়ে বাস্ থামিয়ে সে চুপচাপ অপেক্ষা করতে থাকে স্টিয়ারিং ধরে। বাঘ ওদিকে নিশ্চিন্ত হয়ে শুয়ে আছে, নড়ে না। অগত্যা গাড়ী আবার স্টার্ট দিয়ে সজোরে চালিয়ে দিল শায়িত বাঘের উপর। বাঘের গগনভেদী হুঙ্কর বন কাঁপিয়ে তোলে। বাস্ আবার পিছিয়ে এসে দ্বিতীয়বার বাঘের গায়ে ধাক্কা মারতেই বাঘ পথ ছেড়ে জঙ্গলের দিকে লাফ দেয়, বাস্ও পালায়!

এই সব বনজঙ্গল কেটে এখন পাহাড়ের মাঝে মাঝে লোকবসতি হয়েছে। শহর ও গ্রাম ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে। আগেও হয়ত এমনি হয়েছিল। খাজুরাহোর উৎপত্তিও সেই ভাবেই হয়ে থাকবে।

পাহাড়ের আবেষ্টন ও ঘন বন ছাড়িয়ে বাস্ ক্রমে উন্মুক্ত অঞ্চলে আসে। মাঠের পর মাঠ। কিন্তু উঁচুনিচু, ঢেউ খেলানো। ছোট ছোট টিলা। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড়, বনজঙ্গল। দিগন্তে চক্রাকারে ঘিরে নীল পাহাড়ের শ্রেণী। ছোট ছোট পাহাড়ী নদী। মাঠের বুকে আঁকাবাঁকা তাদের গতিপথ। স্বল্প জল। পায়ে হেঁটে পার হওয়া যায়। বালি কাঁকর পাথর ছড়ানো জমির উপর জন্মেছে কাঁটাবন। এখানে ওখানে মাথা তুলে খেজুর গাছ। শুনি এককালে এখানে এই ধরনের খেজুর গাছই চারিদিক ছেয়ে ছিল, তাই এ-অঞ্চলের নামকরণও হয় খজুরবাটক বা খর্জুরবাহক, তাই থেকে খর্জুরবাহ,—পরে খাজুরাহো। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও খেজুরগাছের মতনই দেখতে কর্কশ, শুষ্ক নীরস।

স্থানীয় সহযাত্রী জানান এখনও নাকি এ-অঞ্চলে ডাকাতের রাজত্ব। প্রসিদ্ধ সর্দার দেবী সিং-এর এলাকা। পাহাড় বা টিলার পিছন থেকে হঠাৎ ডাকাতের দল নামে, লুঠ করে নিমেষে অন্তর্ধান করে। যেমন হঠাৎ আসা, তেমনি চকিতে চলে যাওয়া। যেন, কালবোশেখীর ঝড়! খাজুরাহোর নিকটেই ক'বছর আগে নাকি এইরকম দু'একটা ঘটনা ঘটেছিল। কিন্তু আশ্চর্য হই শুনে, ডাকাতের আচরণের বিরুদ্ধে স্থানীয় জনসাধারণের কোন অভিযোগ নেই, তাদের মনে লুঠতরাজের ভয়ও নেই। শ্রদ্ধার চোখে তারা ডাকাতদের দেখে, সসম্ভ্রমে তাদের কথা বলে। এর কারণ, এই ডাকাতরা নাকি গরীবলোকের ক্ষতি করে না, অর্থশালীর ধন লুণ্ঠন করে দীনদরিদ্রের সাহায্য করে। কোথায় কবে কারা এমনিভাবে সাহায্য পেয়েছিল, তারও গল্প শুনি। গরীবের ঘরের ছেলের কঠিন অসুখ। দূরে শহরে হাসপাতালে পাঠাতে হবে। ডাকাত সর্দার খবর পায়। চলে আসে। সব কিছু ব্যবস্থা করে পাঠিয়েও দেয়।

কবে এক নতুন বিয়ের বৌ চলেছে পাল্কী করে। গায়ে তার সামান্য কিছু গয়না। এক ডাকাত এসে লুঠ করে জিনিসপত্র, গয়না। বালিকাবধূ তারস্বরে কাঁদছে। ডাকাত সর্দার এসে হাজির হয়। মেয়েটি আকুল ভাবে কেঁদে বলে, বাবা আমরা অতি গরীব, আমি তার

একমাত্র সন্তান, টাকা ধার করে আমাকে এই ক'টা গয়না দিয়ে সাজিয়ে শ্বশুরবাড়ি পাঠাচ্ছে.—তোমরা তাই নিলে কেড়ে!

সর্দার তাকে 'মা' বলে আদর করে সবকিছু ফেরত দেয়। সঙ্গে থেকে তার শ্বশুরবাড়িতে পেঁছে দেয়, নিজে খরচা করে আনন্দ উৎসব করে, দলবল নিয়ে নিজেরাও যোগ দেয়। নতুন গয়না এনে মেয়েকে উপহার দেয়। বলে, আমারই মেয়ের বিয়ে দিয়ে গেলাম।

এই সব কারণেই স্থানীয় লোকেরা বলে, আমরা গরীব, আমাদের বলভরসা এই ডাকাত সর্দার, এঁকে ভয় করব কেন?

আমরা অবাক হয়ে শুনি। ইন্দু বলে, এ তো একেবারে রবিন-হুডের কাহিনী!

বেলা সাড়ে দশটায় কিছু দূর থেকে খাজুরাহোর মন্দিরচূড়াগুলি দেখা গেল। বাস্ এগিয়ে চলে। ফটোতে দেখা মন্দিরগুলিও ধীরে ধীরে যেন সজীব মূর্তি পরিগ্রহ করে। আনন্দে ও ঔৎসুক্যে মন ভরে ওঠে।

পেঁছে যাই খাজুরাহোয়।

—সমাপ্ত—

দুধ্ওয়া নামটা শুনে আশ্চর্য লাগে। এই অদ্ভুত নামটা তো বেশী শোনা যায় না। কোথায় সেটা—জানার জন্য লেখক অনুসন্ধান শুরু করেন। নামটা বেশী প্রচার হয়নি তাই রক্ষে, জঙ্গলের আদিম রূপটা আজও বজায় আছে সেখানে। দুধ্ওয়া উত্তরপ্রদেশের লখ্নউ থেকে সীতাপুর ছাড়িয়ে লখিমপুর-খেরী জেলার অন্তর্গত। লখ্নউ থেকে মিটারগেজ ট্রেনে রওনা হয়ে মৈলানী স্টেশনে ট্রেন বদল করে ব্রাঞ্চলাইনে দুধ্ওয়া অভয়ারণ্যে যেতে হয়। এককালে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে এসব জায়গা পর্যন্ত গভীর অরণ্যাঞ্চলের অংশ ছিল। লখিমপুর-খেরীর জঙ্গল বাঘের জন্য প্রসিদ্ধ। এখনও এ অঞ্চলের বাঘের হাতে মানুষের প্রাণ হারানোর ঘটনার সংবাদ মাঝে মাঝে পাওয়া যায়। বাঘ ছাড়া, জলচর হরিণও এই অরণ্যের অনন্য আকর্ষণ। দ্বাদশ-শৃঙ্গী-বারশিঙ্গা পৃথিবীর আর কোথাও নেই। বর্তমানে দুধ্ওয়া অভয়ারণ্যে বনদপ্তরের প্রচেষ্টায় গণ্ডারের থাকার জন্য অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে গণ্ডারের বসবাস শুরু হয়েছে। দুধ্ওয়া অভয়ারণ্যে গণ্ডারও এখন বিশেষ দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে।